প্রেম ও ভক্তি-সাধনা।

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।



প্রথম মুদ্রাঙ্কন।



জেলা হুগলী, এলাটী পোঃ,
শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয়
হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



বঙ্গাব্দ ১৩২২।

মূল্য কাপড়ে বাঁধান—১।৷০ আনা,
এবং কাগজের মলাট—১৲ টাকা মাত্র।

Printed by GOBARDHAN PAN, at the Gobardhan Press,
161, Muktaram Babu's Street, Calcutta.

ভূমিকা

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-নিধিই নিখিল পুরুষার্থের পরাবধি। যেহেতু প্রেমের পণেই সেই অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানকে অতি নিজ-জনরূপে লাভ করা যায়। ভক্তির সাধন এই প্রেমতত্ত্বেরই অনু-শীলন মাত্র। যাঁহারা প্রেমের অন্বেষণে ভক্তির পথে গমন করিতে চাহেন—যাঁহারা ভক্তজীবনের প্রথম সোপানারূঢ় সেই সকল ভক্তি সাধকগণের সহায়তা কল্পেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-অর্জ্জনের নিমিত্ত প্রথমতঃ সাধককে যাহা যাহা করিতে বা শিখিতে হইবে এই গ্রন্থে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

বৈধীভক্তিই রাগানুগাভক্তির সোপান। এইজন্য এই গ্রন্থে রাগানুগাভক্তির আভাসমাত্র দিয়া বৈধীভক্তির চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ পরি-স্ফুটরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রাগানুগাভক্তির সাধনা স্মরণময়ী; সুতরাং তাহার সাধন-প্রণালী স্বতন্ত্ররূপেই সূচিত হয়। তবে, সাধকের রুচি অনুসারে সেই রাগানুগাভক্তি-সাধনাতেও বৈধী-ভক্তির কোন কোন অঙ্গ অনুকূলভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা উপাসনা রাগানুগাভক্তির অন্তর্গত। এজন্য ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল না। রাগা-নুগা ভক্তির সাধন-পদ্ধতি ও সাধক জীবনের অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয় "ব্রজপ্রেম ও উপাসনা" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করি-বার বাসনা রহিল। ফলতঃ ভক্তি-সাধনার প্রারম্ভদশায় ভক্তের যে সকল বিষয় শিক্ষা ও অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক কেবল

সেই সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে লিখিত হইল। যদিও সাধুজনের প্রদর্শিত পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই গ্রন্থে শ্রীহরিভক্তি বিলাস, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, ভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শ্রীগ্রন্থের ভাব ও সিদ্ধান্তমাত্রই সঙ্কলিত করা হইয়াছে, তথাপি মাদৃশ অধমের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা নিবন্ধন হয়তঃ গ্রন্থমধ্যে কোন না কোন ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যই লক্ষিত হইবে। বিশেষতঃ ছাপার ক্ষিপ্রতাবশতঃ প্রুফ দেখার ত্রুটিতে গ্রন্থমধ্যে বহুতর ভুল রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে এই গ্রন্থপাঠে যদি কোন ভক্তি-সাধকের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব। ইতি।

পশ্চিমপাড়া।
চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩২২।

অকিঞ্চন—
শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী।

সূচীপত্র

প্রথম উল্লাস।

দ্বিতীয় উল্লাস।

তৃতীয় উল্লাস।

চতুর্থ উল্লাস।

পঞ্চম উল্লাস।

ষষ্ঠ উল্লাস।

সপ্তম উল্লাস।

অষ্টম উল্লাস।

নবম উল্লাস।

দশম উল্লাস।

শুদ্ধিপত্র।

ছাপার ক্ষিপ্রতাবশতঃ প্রুফ দেখার ত্রুটিতে গ্রন্থ মধ্যে বহুতর ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করা গেল। সহৃদয় পঠকবর্গ ভুল সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে সুখী হইব।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ।
৩	১	ক্যলক্রমে	...	কালক্রমে।
৫	১	মান	...	মানব।
৮	১৭	সুখের সুখ	...	সুখের মুখ।
১০	১৭	প্রণিপাত	...	প্রাণপাত।
১৬	৮	সুখ শরীর	...	সুখ-শরীর।
১৯	২১	ভগবদ্ জনের	...	ভগবদ্ভজনের।
২০	৮	ভগবান্	...	ভবান্।
৪১	১৪	সম্পাৎ	...	সম্পৎ।
৫৬	১	সাধনার বিভিন্ন স্তরে		বিভিন্ন স্তরে।
৬৫	১২	ভিুব	...	বিভু।
৬৬	২২	শাক্ত	...	শক্তি।
৭৪	১৮	বিষ্ঠিত	...	বিলুণ্ঠিত।
৮৪	৬	তেমের	...	প্রেমের।
”	১২	উত্ত	...	উক্ত।
৮৫	৯	বৈষ্ণীভক্তি	...	বৈধীভক্তি।
১০০	৪	ধর্ম্মার্থঃ	...	ধর্ম্মার্থং।
১০৩	১৪	নির্ব্বিকার	...	নির্ব্বিচার।
১২৩	১৭	ভবেৎ	...	জয়েৎ।

ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরায় নমঃ।

প্রেম ও ভক্তি-সাধনা।

প্রথম উল্লাস

সাধনার আবশ্যকতা।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। ধর্ম্ম মানবকে সাধারণ জীব-সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠত্বে—মনুষ্যত্বে উন্নীত করে। মানব সংসার-সাগরে জন্মজন্মের সংস্কার লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে এবং সেই সংস্কার-চালিত কর্ম্মশক্তির তরঙ্গ-তাড়নে মোহাবর্ত্তের গভীরতম কূপে পুনঃপুন নিপতিত হইতেছে,- ধর্ম্মের দৃঢ়-রজ্জু অবলম্বন ভিন্ন তাহার উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। তাই, শাস্ত্র বলেন—

"ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং
ধর্ম্মো ধরা-ধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে
ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥"

মানবের ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মই সম্বল; এই জগৎ ধর্ম্ম দ্বারাই সুরক্ষিত। ধর্ম্মাপেক্ষা সারবস্তু জগতে আর কিছুই নাই।

সংসারে সামান্য পশু হইতে মানব পর্য্যন্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী। জীব জন্মজন্মান্তরে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল কর্ম্মে অভিনিবেশ জন্য কর্ম্ম-স্মৃতি জীবের চিত্ত-পটে অঙ্কিত থাকে, জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সেই স্মৃতি, সংস্কাররূপে বা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। সদ্যপ্রসূত হইয়াই শিশু জননীর স্তনপান করে, হংসাদি অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই জলে সাঁতার দেয়, ইহা জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-স্মৃতির-প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই আহার, নিদ্রা, ভয় ও জীবোৎপাদন, এই পাঁচটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম, জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই পরিলক্ষিত হয়। মানবের জীবন-প্রবাহ এই স্বাভাবিক সংস্কারের বশে উধাও প্রবাহিত হইলে মানবে ও পশুতে আর কোন বিভেদ থাকে না। যেহেতু মানবও প্রবৃত্তির দাস – পশুও প্রবৃত্তির দাস। সুতরাং—

"ধর্ম্মো হি তেষামধিকবিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

বিশেষ ধর্ম্মবলেই মানব পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। নতুবা ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য মানব ও পশুতে প্রবৃত্তিগত কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ মানবে উল্লিখিত পাশবধর্ম্মের অতিরিক্ত কতকগুলি বিশেষ বৃত্তি লক্ষিত হয়। মানবের হিতাহিত জ্ঞান ও অহংবোধ আছে, বিচার বুদ্ধি আছে, কিন্তু পশুর তাহা নাই। পশু নিরবচ্ছিন্ন আপনার প্রবৃত্তির পথেই পরিভ্রমণ করে। এক্ষণে এই সংশয় হইতে পারে, তবে কি, মানবেতর জীব কেবল পশু-জীবনেই আবদ্ধ থাকে?—তাহাদের জীবনের ক্রমোৎকর্ষ হয় না?—তদুত্তর এই যে, স্বভাবের গতিতে ভগবৎ-প্রদত্ত এমন একটী মঙ্গল-বীজ

নিহিত আছে, যাহাতে জীবের স্বভাবতঃ ক্যলক্রমে উচ্চগতিই লাভ হইয়া থাকে। হয়তঃ এই বাক্যে অনেকের মনেই এই সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি স্বভাবতঃ জীবের ক্রমশঃ উচ্চজীবন লাভ ঘটে, তবে আর ধর্ম্ম-সাধনার আবশ্যকতা কি? তদুত্তর এই যে, জীব আনন্দময় শ্রীভগবানের অচিন্ত্য বিভিন্নাংশ, সুতরাং আনন্দ-উপভোগই জীবের স্বধর্ম্ম। জীব, মায়া-পিশাচীর কুহক-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যখন আপনার স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যায় তখন নিত্য-বদ্ধ-দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই—

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
* * * * শ্রীচরিতামৃত।

যতদিন জীব কৃষ্ণ-সেবারূপ স্বধর্ম্মের অনুশীলন না করে—শ্রীকৃষ্ণ ভজনোন্মুখ না হয়, তদবধি তাহাকে জন্ম জন্ম সংসার-যাতনা ও পূর্ব্বোক্ত মায়া-পিশাচীর দণ্ড-তাড়না সহ্য করিতে হয়;—এমন কি স্বকৃত কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।—

"এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

এই অসহনীয় জন্ম-যাতনা ও মায়া-পিশাচীর দণ্ড-তাড়না হইতে পরিত্রাণের নিমিত্তই জীবের ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা।

সত্যবটে, মহাপ্রলয়ের সময়ে যখন এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য—এই জৈবরাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভগবানের বিরাট-বপুতে বিলীন হইবে, তখন হয়ত, পাপী পুণ্যবান্, জ্ঞানী অজ্ঞান, ভক্ত অভক্ত নির্ব্বিশেষে একই গতি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে জীবকে কত কোটী কোটী জন্ম যে দুর্ব্বিসহ সংসার-যাতনা ভোগ করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা কি? কিন্তু ইহাও সম্ভব বোধ হয় না। জলে লবণ মিশিয়া গেলেও যেমন লবণ-স্বাদের বিলোপ হয় না, এসিডে কুইনাইন গলিলেও যেমন তাহার তিক্তাস্বাদের ব্যত্যয় হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মে জীবের লয় হইলেও জীব-স্বভাবের লয় হয় না। যেমন জলে বা এসিডে লবণ বা কুইনাইনের উপাদান অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করে, সেরূপ ব্রহ্মেও জৈব-উপাদন অদৃশ্যভাবে লীন থাকে, পুনরায় জীব-সৃষ্টির সময় ভগবান্ সেই সেই উপাদান দিয়াই বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি করেন। অতএব জীবকে যাহাতে পুনঃপুনঃ জরা-জন্ম-মৃত্যু কি সুখ-দুঃখ-শোক-তাপের অধীন হইতে না হয়, বর্ত্তমান জন্মেই তাহার প্রতিকারের পন্থানুসরণ করা কি কর্ত্তব্য নহে?

প্রাক্তন পুণ্যপুঞ্জের ফলেই দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ হয়। জানিনা, কোন্ কর্ম্মসূত্রে আবার পরজন্মে কোন্ জীব-যোনিতে জন্মলাভ ঘটে! সুতরাং এমন ভজনযোগ্য দুর্লভ মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া কেবল পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইলে জীবন কেবল বিড়ম্বনাময় হইয়াই উঠে। কিন্তু ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা মানব ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর উন্নত জীবন লাভ করিয়া সেই প্রেম-

ময়ের কৃপাসান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারে। এইজন্য মানব মাত্রেরই ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। মানবের যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধি আছে—ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তথাপি যদি মানব সংস্কারবশে কেবল পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই মানব-জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করে, তাহা হইলে তাহার মনুষ্যত্ব রহিল কই?

স্বভাবতঃ মানব মাত্রেই কিছু না কিছু ধর্ম্ম-চিন্তা করিয়া থাকে। প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ হইতেই মানবের এই ধর্ম্মচিন্তার তারতম্য লক্ষিত হয়। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মানবও তিনপ্রকার স্বভাবের আছে। যাহারা তামসিক-প্রকৃতি—যাহাদের প্রজ্ঞাশক্তি অজ্ঞান ও মোহের গাঢ়ান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারাও সময়ে সময়ে ধর্ম্মাচরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। তবে, তাহাদের সে ধর্ম্ম-চিন্তা আত্মত্রাণের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, প্রবৃত্তি-সাধক কোন কর্ম্মের সাফল্য লাভের উদ্দেশেই তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দস্যুদল যখন লোকের ধন-প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে যায়, তখনও তাহারা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া থাকে। একটী ব্যাধি-পীড়িত শিশু-পুত্রের জীবন রক্ষার্থ দেবতার নিকট দুইটী ছাগ-শিশু-নিধনের ব্যবস্থা করা হয়। এইগুলি তামসিকভাবে ধর্ম্মাচরণ। ইহাতে জীবের কর্ম্মপাশ ছিন্ন না হইয়া বরং জীব আরও নূতন নূতন কর্ম্মপাশের জটিল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যাহা হউক ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম-চিন্তা মানব জাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্যজাতির মধ্যে যাহারা হিংস্র-জন্তুর ন্যায় পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যেও ধর্ম্ম-ভাব লক্ষিত হয়, তাহারাও সূর্য্য-চন্দ্র, নদ-নদী, গিরি-তরু প্রভৃতিকে ধর্ম্মবিশ্বাসে পূজা করিয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে,

জীব, অজ্ঞানতার নিবিড়-তিমিরে যতই আচ্ছন্ন হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত তাহাতে চৈতন্যের বিকাশ থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় কিছু না কিছু ধর্ম্মের স্ফুরণ মধ্যে মধ্যে অবশ্যই প্রতিভাত হইবে।

ধর্ম্ম এক, অনাদি ও শাশ্বত। তবে যে ধর্ম্মের বহু প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়, উহার কারণ প্রাকৃতিক গুণ ভেদ মাত্র। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অধিকারী বিশেষে ধর্ম্মের বহু-বিভেদ সূচিত হইয়াছে। এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই সহোদরের মধ্যে যখন আকৃতি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সকল মনুষ্যই যে একই ধর্ম্ম-সাধন-পথের পথিক হইবে—একই ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য মুখ্যাংশে উপাস্যতত্ত্ব এক হইলেও গৌণাংশে উপাসনা-প্রণালীর বহু বিভেদ লক্ষিত হয়। প্রবৃত্তি অনুসারে সাধনমার্গ অবলম্বিত হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম গুণ ভেদে যাঁহার যেমন প্রবৃত্তি তিনি সেইরূপই ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাচার্য্যগণ অধিকার বিশেষে যাহার জন্য যে যে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সেই ধর্ম্ম-প্রণালীতে নিষ্ঠাস্থাপন মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ গুণগত ধর্ম্ম জাতীয়তায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলেই বর্ণ-ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। কিন্তু গুণের ক্ষয় হইলে সার্ব্বজনীন উদার-ধর্ম্মের বিমলজ্যোতি সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দাহন্যত্র চাপি হি।"

ভাঃ ১১।৩

বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ ভগবানের ভজনা কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজন-প্রণালীর নিন্দা করিও না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভেদের পরস্পর নিন্দা না করিয়া জ্ঞানোদয়ের সময় হইতেই শ্রীভগবানের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, মৃত্যুর পর-পারে যে কি আছে, তাহা যখন আমরা জানিতে বা দেখিতে পাই না—পর-জন্ম আছে কি না তাহারই যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন পারলৌকিক সুখভোগের জন্য এত কঠোর সাধন ভজনের আবশ্যকতা কি? তদুত্তর এই যে, যখন অন্ধকারের পর আলোক আছে, আবার আলোকের পর অন্ধকার আছে, দিবার পর রাত্রি আসে, আবার রাত্রির পর দিবসের উদয় হয়। পরন্তু যখন তামসী অমানিশার পর পূর্ণিমার প্রশান্ত জ্যোতি উদ্ভাসিত হয় এবং শীতের পর গ্রীষ্ম গ্রীষ্মের পর শীতের আগমন অনিবার্য্য এবং জন্মের পর জীবের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী. তখন মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম যে হইতে পারে না, তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং জীবের মৃত্যুর পর যে আবার জন্ম আছে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এইরূপে জড়-দেহাতীত চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে পরজন্ম ও শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কর্ত্তব্যও অবশ্য স্বীকৃত হইয়া যায়। এই পর-কাল ও পর-জন্ম আছে বলিয়াই জীবের ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যাহাতে পর-কালে বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা আরও উন্নত জীবনলাভ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হওয়া যায় তাহার জন্য মানব মাত্রেরই যত্নপর হওয়া উচিত।

যদি মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা ঘোর তিমিরাচ্ছন্নই হয়, তাহা হইলেও সাধনার আবশ্যকতা আছে। কারণ পূর্ব্ব হইতে সঞ্চয়

না থাকিলে পরকালের পথে উপাসনা-মূলক পাথেয়ের আবশ্যক হইলে, কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং এখন হইতে সাধন-লব্ধ সম্বল সঞ্চয় করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আর যদি সেরূপ সম্বলের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলেও ত কোন ক্ষতি নাই! বরং ইহজগতে ধর্ম্ম-জীবন আনন্দেই অতিবাহিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য!!

জীবের উপাসনা স্বাভাবিক। জীব উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না। অভাব বা দুঃখ বোধ হইলেই, তাহা দূর করিবার জন্য, যাঁহার দ্বারা সে অভাব বা দুঃখ দূর হইতে পারে, তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই দরিদ্র—ধনীর উপাসনা করে, দুর্ব্বল—সবলের উপাসনা করে, অজ্ঞান—জ্ঞানীর উপাসনা করে, পীড়িত—বৈদ্যের উপাসনা করে, বদ্ধ—মুক্তিদাতার উপাসনা করে। এইরূপ উপাসনা-প্রণালী জীবেব স্বাভাবিক বৃত্তি। তবে যাহারা তামসিক-স্বভাব তাহারা নিজের আহার, নিদ্রা ভয় ও সন্তানোৎপাদন লইয়াই ব্যস্ত থাকে এবং যদ্দ্বারা এই গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপাসনা করে। ইহাদের প্রজ্ঞাশক্তি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, ইহারা প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পায় না। যাহারা রাজসিক তাহারাও নিত্য অভাবগ্রস্ত বলিয়া দুঃখ পায়। তাহাদের আশার নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং সর্ব্বদা বিষয়ের উপাসনা করে। যাহারা সাত্ত্বিক তাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই জন্যই রজস্তমকে পরাস্ত করিয়া সত্ত্বগুণ উন্মেষিত করিবার নিমিত্তই সাধনার আবশ্যকতা।

মানব সংসারে ভব-রোগাক্রান্ত ও মায়াবদ্ধ, অজ্ঞানজনিত বহু

দুঃখ-নিপীড়িত এবং শোক-তাপের তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত। যিনি এই নিদারুণ দুঃখ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন, মানব এমন শক্তিমানের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে কি এই জন্যই মানবের ঈশ্বর-উপাসনা স্বাভাবিক। যদি বল, সকল মানুষ ত উপাসনা করে না, তবে যে উপাসনা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তর এই যে, সূর্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম আলোক ও তাপ বিকীরণ। কিন্তু সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে আর আলোক ও তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে সূর্য্যের স্বভাব নষ্ট হইয়া গেল? মানবের প্রকৃতি রজস্তমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে আর উহাতে ভগবৎ-উপাসনা-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় না, কেবল বিষয়েরই উপাসনা হয়। এইরূপে কোন কোন মনুষ্য উপাসনা করে না বলিয়াই কি উপাসনার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইয়া গেল? ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সত্বগুণের বিকাশ হইলে সে ব্যক্তিও একদিন না একদিন ভগবানের উপাসনা করিবে।

আরও দেখ সংসারে কেহই দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, জীব মাত্রেই সুখের অভিলাষী। জীব আনন্দময়ের অংশবিভূতি বলিয়াই অর্থাৎ জীবের স্বরূপ নিত্য আনন্দময় বলিয়াই জীব স্বভাবতঃ আনন্দের সুধাস্বাদ লাভের জন্য লালায়িত হয়—সুখ-সৌরভের মোহন আকর্ষণে ভ্রমরের ন্যায় আকৃষ্ট হয়। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছেনা, জীবের চিত্তবৃত্তি প্রাকৃত সুখ দুঃখের অতীত! এই জরা-জন্ম আধি-ব্যাধি-পীড়িত অনিত্যধামের অতীত এক অচিন্ত্য-চিন্ময়-ধামে জীবের জন্য এক অনাবিল আনন্দরসের অবাধ-উৎস নিরন্তর উৎসারিত রহিয়াছে—যাহার জন্য জীবের চিত্ত

স্বতঃই তাহার দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। আনন্দের জীব আনন্দে থাকিতেই ভালবাসে; কিন্তু কর্ম্ম-বৈগুণ্যে মায়ার প্রলোভনে পতিত হইলে আর সে আনন্দবোধ থাকে না। ভক্তির অনুশীলনে মূর্ত্তানন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ, মনন ও অনুধ্যানে জীবের সেই আনন্দানুভূতি বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ সাধকের হৃদয়ে সেই আনন্দরসের ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে। সাধক তখন বুঝিতে পারেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেনৈব জীবানি জীবন্তি, আনন্দং
প্রত্যয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।" শ্রুতি।

অর্থাৎ আনন্দ হইতেই নিখিল ভূতের উৎপত্তি, আনন্দ দ্বারাই তাহারা জীবিত রহে, আনন্দকেই বিদিত হয় এবং অবশেষে আনন্দেই প্রবেশ করে।

অতএব আনন্দময় শ্রীগোলোকধামে আনন্দ-রস উপভোগের জন্য জীবের ধর্ম্ম-সাধনা একান্ত আবশ্যক।

জীবের মানবদেহই ভজনযোগ্য দুর্লভ দেহ। সুতরাং এমন দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া কেবল প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রণিপাত করিলে কোন ফলোদয় হইবে না, জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে যত্নপর হওয়া একান্ত উচিত। বিশেষতঃ মানব-জীবন অস্থির, জল বুদ্বুদের মত কখন কাল-সাগরে মিশিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে?—দেহ-বৃন্তচ্যুত হইয়া জীবন-কুসুম কবে ঝরিয়া পড়িবে। সুতরাং কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে যখনই মানবের এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখনই সাধনায় মনো-

নিবেশ করা শ্রেয়। বিশেষতঃ বাল্যজীবনে ধর্ম্মাভ্যাস করিলে পরিণত বয়সে তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-সুলভ হইয়া পড়ে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদি অতি শৈশবেই শ্রীভগবৎ-প্রসাদ লাভে ধন্য হইয়াছেন এবং ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।"

জীবন ক'দিনের জন্য; সংসারে বাল্যকাল হইতেই, ভাগবত ধর্ম্ম-আচরণ করিবে।

বহু জন্মের পুণ্যপুঞ্জের ফলেই এই দুর্লভ মানবদেহ লাভ হয় এবং ইহা অনিত্য হইলেও সুফলপ্রদ। যেহেতু, এই দেহ দ্বারাই শ্রীভগবানের তুষ্টি সাধন করা যাইতে পারে। সুতরাং মৃত্যু-পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, এই ভাবিয়া অবিলম্বে ভজন পথের পথিক হওয়া মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য বলিয়াই ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে কেহ ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, কেহ বা নরকভয়ে বা ব্যাধিভয়ে ভীত হইয়া সাধনপথ অবলম্বন করেন কেহ বা সংসারে উন্নতির আশায় বিষয়-সুখ প্রার্থনা করিয়া হরি-ভজন করিয়া থাকেন। এই সকল সাধনশীল ব্যক্তিগণের সাধনা তাদৃশ বিশুদ্ধ না হইলেও শ্রেয়প্রদ। ভয়ে ও আশায় যে উপাসনা তাহা বলপূর্ব্বক করাইতে হয়। ইহা সকাম। ভয় বশবতঃই কংস শ্রীকৃষ্ণে বৈরিভাব স্থাপন করিয়া শেষে মুক্তিলাভ করেন এবং ধ্রুব রাজ্য-প্রাপ্তির আশাতেই হরি-ভজনে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধির শাসনে শাস্ত্র-বিধি মানিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বিধিমার্গের সাধক। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানে উপাসনাই অনুরাগের নিম্নস্তর স্তর। অনুরাগে যে

উপাসনা তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই শুদ্ধ-ভজনই নিষ্কাম। অতএব স্বভাবতঃ ভগবানের ভজনে যাঁহারা অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং ভগবদ্ ভজনেই একান্ত প্রীতি লাভ করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম সাধক—রাগমার্গের পথিক। রাগমার্গের অন্তর্গত ভজনের প্রাণ—অনুরাগ। আর বিধিমার্গের অন্তর্গত সাধনার প্রাণ শ্রদ্ধা। এই উভয়বিধ সাধনাতেই নিরুপাধি ভক্তি বা প্রেমের উদয় হয়। বিমল প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং যে ধর্ম্মে-যত অধিক প্রেমের বিকাশ হয়—বিমল প্রেমই যে ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, জীবের পক্ষে সেই প্রেমের ধর্ম্ম-পথ অনুসরণ করাই একান্ত বিধেয়। মায়াবাদ, জড়বাদ, কর্ম্মবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিভিন্ন মত-বাদগুলি সম্পূর্ণ প্রেম-বিরুদ্ধ। একমাত্র ভক্তিবাদই নির্ম্মল প্রেমের দ্যোতক। প্রেমের পরাবধি এই ভক্তি ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই নিখিল পর-পুরুষার্থের সীমা। সুতরাং প্রেমই জীবের নিত্য প্রয়োজন। যাহার সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই জীবের নিত্য প্রয়োজন।

"সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"



দ্বিতীয় উল্লাস

প্রেমতত্ত্ব।

এক অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ-মধুর অচিন্ত্য মহাকর্ষণের নাম প্রেম। এই বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিবে এক অজানিত প্রেম-প্রবাহ - এক প্রহেলিকাপূর্ণ সরস আকর্ষণ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই আকর্ষণের শক্তিতেই ব্যোমপথে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র অনন্তকাল ব্যাপিয়া আপন আপন কক্ষে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এই আকর্ষণের প্রভাবেই মানব-সমাজ এক মধুর সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এই যে একটী মানবের প্রাণ, আর একটী প্রাণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে—আপনার করিয়া ভালবাসে—হৃদয়ের অন্তস্তলে রাখিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না, নিমেষের অদর্শনেই চিত্তে কত আবেগ আকুলতা ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রেমের স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিতে যেমন প্রাকৃত জগতের তাবৎ পদার্থ পরস্পর সন্নিবদ্ধ ও ব্যবস্থিত রহিয়াছে, সেইরূপ অন্তর্জগতেও প্রেমের মোহন আকর্ষণে মানব প্রাণে প্রাণে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট ও বিজড়িত রহিয়াছে। এই প্রেমাকর্ষণের আধিক্য ও অল্পতার তারতম্যে উক্ত সম্বন্ধ-নৈকট্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই পদার্থের বায়বীয়, তরল ও ঘন এই ত্রিবিধ অবস্থান্তর ঘটে। বিপ্রকর্ষণের প্রভাবে পদার্থের বায়বীয়তা এবং আকর্ষণ-প্রভাবেই পদার্থের ঘনত্ব উপস্থিত হয়। আর আকর্ষণ

ও বিপ্রকর্ষণের সাম্যাবস্থাতেই পদার্থের তরলতা সম্পাদিত হয়। ইহাই জড় জগতের রীতি। এইরূপ জড়াতীত চিন্ময়-জগতেও বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও প্রেমভক্তি আকর্ষণী-শক্তি এবং মায়া বিক্ষেপিকাশক্তি নামে অভিহিতা। প্রেমের আকর্ষণী-শক্তিতে জীবের ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হয়। জীবের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবাহ সাগরাভিসারিণী জাহ্নবীর ন্যায় প্রেমসিন্ধু শ্যাম-সুন্দরের দিকে উধাও ধাবিত হয়। আর মায়ার বিক্ষেপিকা-শক্তিতে মানব ভগবদ্বিমুখ হইয়া আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু সঙ্কুল সংসার-সাগরে নিপতিত হয়! সুতরাং প্রেমই জীবের সাধ্য—প্রেমই জীবের প্রয়োজন।

প্রেমের ধর্ম্মই এই, উহা একা থাকিতে পারে না। কোন একটী তত্ত্বকে **আশ্রয়** করিয়া থাকে এবং কোন একটী তত্ত্বকে **বিষয়** বলিয়া বরণ করে। সুতরাং বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না। জীব-হৃদয়ই প্রেমের আশ্রয় একমাত্র প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। "শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় তত্ত্ব-পুরুষ, আমরা তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-কল্পতরু, জীব বা তটস্থাশক্তি তাঁহার আশ্রিত লতিকা।

প্রেমের প্রাথমিক অবস্থাই ভক্তি নামে অভিহিতা এবং এই ভক্তিবৃত্তির পূর্ণ-পরিণতিই প্রেম। যেমন মুকুল-নির্ম্মুক্ত ক্ষুদ্র আম্রই পরিশেষে সুরসাল পক্ক আম্রে পরিণত হয়। একই জীবের যেমন শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়াদি বিভিন্ন অবস্থান্তর সূচিত হয়, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তিই ক্রমশঃ উৎ-কৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিলে, প্রেম নামে অভিহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের যে নিত্য-সুখ-সম্বন্ধ

তাহার নামই বিমল প্রেম। প্রেম পূর্ণ চিদানন্দস্বরূপ তত্ত্ব। জড় জগতের সহিত চিত্তত্ত্বের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?—এই সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই ভক্তিরূপা প্রজ্ঞা উদিত হয়। এই ভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ময়ী হইলেই সাধন ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সাধন ভক্তি হইতে অনর্থ-নিবৃত্তির পর নিষ্ঠাদি ক্রমে যে ভাবের উদয় হয়, প্রেম সেই ভাবেরই ঘনীভূত অবস্থা। সুতরাং প্রেম শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। লৌকিক প্রেম জীব-শক্তির বৃত্তি, তাহা জীবের স্বাভাবিক। কিন্তু অলৌকিক প্রেম শ্রীভগবৎ-পরিকরগণের নিজ সম্পত্তি হইলেও উহা ভগবৎ-কৃপায় সুর-সরিৎ-প্রবাহের ন্যায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ও শুদ্ধজীবের স্বভাবের সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পায়। এজন্য এই অলৌকিক প্রেমকে জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি বলা হইয়াছে।

"সত্ত্ব এবৈক মনসোবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥"

স্বাভাবিকীবৃত্তি অর্থাৎ আনুকূল্যাদিব্যঞ্জক জ্ঞানবিশেষের নামই ভাগবতী ভক্তি। ভক্ত ও ভজনীয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইতেই ভক্তির বিকাশ। এই অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিবরিষ্ঠা ভক্তির পরিণতিই প্রেম। প্রেম সাধকের হৃদয়ে স্বতঃই স্ফুরিত হয়।

"প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে"।

সুতরাং প্রেম সাধ্যভূত নহে। ভক্তের শ্রবণকীর্ত্তনাদি-শোধিত হৃদয়-পটে এই প্রেমের বিমলপ্রভা আপনা হইতেই পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

"নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥" শ্রীচরিতামৃত।

জীবের সৌভাগ্য-গগণে প্রেম-সূর্য্যের উদয় হইলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সুখ-শতদল বিকসিত হয়, জীব তাহার মধুস্বাদে চিরতরে অক্ষয়তৃপ্তি ও অনন্ত শান্তিলাভ করে। প্রেমে ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্তর্মুখীন হইয়া সেই প্রেমময় প্রাণের দেবতার উদ্দেশে প্রধাবিত হয় এবং কেবল তাঁহারই সেবা-সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় নিরন্তর উন্মুখ রহে। যত প্রেমের বৃদ্ধি, ততই আত্ম-সুখপরতার হ্রাস, ইহাই প্রেমের লক্ষণ। প্রেমিক যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্রই ইষ্ট-স্ফূর্ত্তি দেখিতে পান। "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" যেহেতু প্রেম অন্য বিষয় সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া প্রেমিককে প্রিয়তমের সম্বন্ধে চক্ষুষ্মান্ করে। সুতরাং প্রেম অন্ধ নহে—জীবের প্রকৃত চক্ষু। দৃশ্য বস্তুর সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত বিজ্ঞানের এবং ক্রেয় বস্তুর সহিত রত্নাদির যে সম্বন্ধ, প্রেমের সহিত ভগবানেরও সেই সম্বন্ধ। উহা জ্ঞানের সার বিজ্ঞান—পুরুষার্থের সার পঞ্চম পুরুষার্থ। মানব প্রেমের সাহায্যেই শ্রীভগবানের মধুরমূর্ত্তি নয়নগোচর করেন, সাক্ষাৎ অনুভব করেন, এবং প্রেমের পণে শ্রীভগবানকে চিরদিনের মত ক্রয় করিয়া লয়েন। ভগবান্ একমাত্র প্রেমের অধীন, প্রেম ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। সুতরাং প্রেমলাভ হইলেই জীবের সাধনার শেষ হইল। ভগবান্ নিত্য আনন্দস্বরূপ; অতএব ভগবান্কে অবলম্বন করিয়া প্রেমও নিত্য। প্রেম অশরীরী আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, স্থূল শরীরের সহিত নহে। সুতরাং আত্মার ন্যায় প্রেমও অনাদি নিত্য ও শাশ্বত। এই জন্যই প্রেম আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মক। হৃদয়-রঞ্জক প্রেমের ঠাকুরটী আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া প্রেম আনন্দেই প্রতিভাসিত হন। আনন্দই রস,

রসই প্রেমের প্রাণ। "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসের-স্বরূপ। তাই—

"রস হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

জীব, তাঁহার রসলাভ করিয়া—তাঁহাতে প্রেম করিয়া আনন্দিত হয়। তিনি মূর্ত্তানন্দ—আনন্দের অমৃতনিধি; তাই, তাঁহার স্মরণ-মননে প্রাণে আনন্দের অমৃত-লহরী খেলে, প্রেমে হৃদয়-তট পরিপ্লুত হইয়া উঠে।

প্রেম, প্রেমাস্পদকে নিত্য-নূতন মাধুর্য্যে অনুরঞ্জিত করে। তাই, প্রেমিকের নিকট প্রেমময় চির-নূতন। জননীর নিকট পুত্রের চাঁদমুখ কি কখন পুরাতন হয়? প্রেম, সরসী-সলিলের মত সসীম নহে, উহা অনন্ত-বিসারী মহাসিন্ধু। প্রেম স্বীয় কেন্দ্রে—শ্রীভগবানের চরণ-পদ্মে অবস্থান করিয়াও বিশ্বরাজ্যে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য প্রেমিক জগতের ছোট বড় কোন জীবকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। ইহারই ফলে সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ও জীবে দয়া উপস্থিত হয়।

প্রেমের স্বরূপ অব্যক্ত। জগতে এমন কোন বস্তু নাই—এমন কোন ভাষা নাই, যদ্দ্বারা এই প্রেমতত্ত্বকে বুঝাইতে পারা যায়। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।" ভক্তিসূত্র।

প্রেমের এমনই মহীয়সী শক্তি, উহা অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করে। জড়-বিজ্ঞান, এই প্রেম-বিজ্ঞানের কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। প্রেম—

"স্বতন্ত্রতাকে—পরতন্ত্রতায়, পর্য্যবসিত করে,

"স্বার্থকে—পরার্থে বা ভগবদর্থে এবং

"অহঙ্কারকে—দীনতায় পরিণত করে।

"অণুচৈতন্যকে—বিভু চৈতন্যে—

"শক্তিকে—শক্তিমানে আত্মসমর্পণ করায়।

"অনন্ত পরব্রহ্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়া অবশেষে তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদসূত্রে বন্ধন করে।

"জীবের প্রভুত্ব বা অহংজ্ঞানকে চির-বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিয়া নিত্য দাস্যবুদ্ধি উন্মেষিত করে।

"হৃদয়ের মোহ-তিমির বিদূরিত করিয়া সুখ-শরীর বিমল জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করে এবং নীরস চিত্তের সারস্য সম্পাদন করে।

এই প্রেম গুণাতীত হইয়া ভগবানের অভিমুখে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নিরন্তর প্রবাহিত, অথচ ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অনুভব স্বরূপ। উহা আত্মার সহিত মিলিত হইয়া মানবের স্বাভাবিকী বৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইলেই অনুভবের বিষয়ীভূত হয়। পাষণ্ডের পাষাণ-কঠিন হৃদয়ও এই প্রেমামৃতের কণামাত্র পরশে আনন্দের আবেশে দ্রবীভূত হয় এবং ভগবান্‌কে প্রাণের মধ্যে অনন্তমাধুর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপ বুঝিয়া ভক্তির প্রাণভরা উচ্ছ্বাসে তাঁহার চরণপ্রান্তে চিরদিনের মত লুঠাইয়া পড়ে। অতএব প্রেমই পরম পুরুষার্থ।—

"সংক্ষেপে কহিল প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

পুরুষার্থের লক্ষণ কি? শাস্ত্র বলেন—

"পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকার-লক্ষণং তজ্ জ্ঞানমেব পরমানন্দ

প্রাপ্তিঃ সৈব পরম পুরুষার্থ ইতি।"

যাহা দ্বারা পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এবং ভগবৎ-জ্ঞানরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় তাহার নামই পরম পুরুষার্থ। এই প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ মোক্ষের উপরিচর। অজ্ঞানের নাশ ও দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির নামই মোক্ষ। অজ্ঞান ও দুঃখনাশ প্রেমের আভাসমাত্রেই সংসিদ্ধ হয়, সুতরাং মোক্ষের পর হইতেই এই প্রেমানন্দপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে। পরতত্ত্ব স্বপ্রকাশ বলিয়া এই পরতত্ত্বের বিলাসরূপ প্রেমতত্ত্বেরও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ হইতেছে।

এই প্রেমভক্তি প্রীতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"ইয়মেব ভগবৎপ্রীতির্ভক্তি শব্দেনাপ্যুচ্যতে
পরমেশ্বরনিষ্ঠত্বাৎ।"

এই আনন্দাস্বরূপা প্রীতিই ভগবৎ-প্রাপ্তির অব্যর্থ উপায়। যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"নিরস্তাতিশয় হ্লাদ-সুখভাবৈক-লক্ষণা।
ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তি রেকান্তাত্যন্তিকা মতা॥"

প্রীতির স্বরূপই সুখ। সুখলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। সংসারে আমরা যাহা সুখ বলিয়া বরণ করি, উহা মরীচিকায় জল ভ্রম মাত্র। প্রকৃত পরমসুখ, ভগবদ্ভজনের দ্বারাই লাভ হয়। উহাই প্রীতির আস্পদ। সুতরাং সুখের অনুভবে প্রধানতঃ প্রীতিরই অনুভব হইয়া থাকে। অতএব প্রীতিই মানবের নিত্য প্রয়োজন।—

"পুরুষেণ সৈব সর্ব্বদান্বেষিতব্যেতি।'

আবার এই প্রেম 'কৈবল্য, নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। 'কেবল' শব্দের অর্থ শুদ্ধ; তাহার ভাব-কৈবল্য। সুতরাং ভগবদনুভবময় শুদ্ধজ্ঞানই কৈবল্য নামে অভিহিত। ইহাই পরম পুরুযার্থ। অথবা কৈবল্য শব্দ শ্রীভগবানের স্বভাবকে বুঝায়। যথা, স্কন্দ পুরাণে—

"ব্রহ্মেশানাদিভি দে বৈ র্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
স যৎ স্বভাবঃ কৈবল্যং স ভগবান্ কেবলো হরে॥"

হে হরে! ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হয়েন না, সেই যে স্বভাব তাহার নাম কৈবল্য। অতএব প্রেম ভগবানের স্বভাব বলিয়াই কৈবল্য নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের সম্বিৎশক্তি ও হ্লাদিনী শক্তি,—এই দুইটী স্বরূপ শক্তির সারাংশরূপা রতিই প্রেমভক্তি। প্রেমের লক্ষণ, যথা—

"সম্যক্ মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাব স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

যাহা দ্বারা চিত্ত সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা চিত্তকে প্রিয়জনের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত করে এতাদৃশ ঘনীভূত ভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া থাকেন।

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনো স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বিনাশের কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যাহা সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত অর্থাৎ কোন প্রকারেই যাহার বিনাশ হয় না, যুবক-যুবতীর এরূপ সরস ভাব-বন্ধনের নাম প্রেম।

বিশুদ্ধ প্রেম ভগবানেই প্রযুক্ত হয়। বিষয়ান্তরে যে প্রেম-লক্ষণের বিকাশ লক্ষিত হয়, তাহা শুদ্ধ প্রেমের আভাস মাত্র। তাই, নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমসমন্বিতা মমতার উদয় হয়, তাহাকেই ভীষ্মাদি ভক্তচূড়ামণিগণ ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মমতাবিশিষ্টা ভক্তি বা প্রীতিই প্রেম নামে অভিহিত।

এক্ষণে ইহাতে এই প্রতীত হইতেছে যে, কেবল ভগবন্মাধুর্য্য-তাৎপর্য্যেই প্রীতির প্রীতিত্ব সিদ্ধ হয়। নতুবা অপর কোন তাৎ-পর্য্যাদিতে প্রীতি লক্ষিত হইলে তাহা প্রীতির অপূর্ণ আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। প্রীতির আবির্ভাব দ্বিবিধ। তদাভাস ও ঈষদুদ্গম। প্রীতির উদয় অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য-তাৎপর্য্য-সূচিত হইলে তাহাকে 'তদাভাস' আবির্ভাব কহে। দ্বিতীয় ঈষদ্ উদ্গম আবার দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়। ১ম, কদাচিদ্ উদ্ভবশীল, ২য়, তাহার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উদয়াবস্থায় প্রীতি-তাৎপর্য্য অন্যাসঙ্গ-রূপে অর্থাৎ গৌণরূপে কদাচিৎ দৃষ্ট হইলে তাহার নাম কদাচিদ্ উদ্ভবশীল এবং উক্ত উদয়াবস্থায় প্রীতি-তাৎপর্য্যের প্রায় অভাব লক্ষিত হইলে উহা 'কদাচিদ্ উদ্ভবশীল-ছবিমাত্রত্ব' নামে অভিহিত।

এই সকল প্রীতি-আবির্ভাবের বিভিন্নাবস্থার মধ্যে যাহাতে অন্যাসঙ্গ বা গৌণত্ব বিদ্যমান নাই, সেই প্রীতির প্রভাবই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাই প্রীতির প্রকট উদয়াবস্থা। জীবের চিত্তবৃত্তিতে এই প্রীতির আবির্ভাব আরম্ভ হইলেই

উহা ভক্তি নামে আখ্যাত হইয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করে এবং পরিশেষে এই প্রীতি মমতাযুক্ত হইয়া প্রেমসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেই জীবের ভগবৎ-পার্ষদতারূপ পরামুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

এই ভাগবতী প্রীতির উদ্বেল উচ্ছ্বাসে হৃদয় তট প্লাবিত হইলে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি এক মনোমদ মধুর ভাবে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই ভাগবতী প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ এই যে ইহা বিষয়ান্তর দ্বারা কদাচ অবচ্ছেদ্যা নহেন এবং অন্য কোন তাৎপর্য্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা একমাত্র ভগবত্তাৎপর্য্য-ময়ী ও হ্লাদিনীশক্তির সার-বৃত্তি-স্বরূপা। ভগবৎ-আনুকূল্যাত্মক ও ভগবৎ-স্পৃহাদিময় জ্ঞান-বিশেষই ইহার আকার এবং ভক্তের মনোবৃত্তি বিশেষই ইহার দেহ। এই প্রীতি পবিত্র পীযূষ-ধারা অপেক্ষাও এক হৃদয়গলান প্রাণ-মাতান রসের ধারায় নিজেই নিজের দেহ সরস করেন। ভক্ত-কৃত আত্মরহস্য-সঙ্গোপন গুণই ইহাঁর বসন, ভাব-বিগলিত অশ্রু মুক্তামালাদিই ইহাঁর ব্যক্ত অলঙ্কার। ইনি নিখিল গুণের নিধান স্বরূপা এবং অশেষ পুরু-ষার্থ-শ্রী ইহার দাসী। ভগবৎ-পাতিব্রত্যই ইহাঁর একমাত্র ব্রত। এই জন্যই প্রীতি, নিখিল পরমানন্দস্বরূপ, অনন্ত বিলাসময় শ্রীভগ-বানেরও মনোহরণের একমাত্র উপায় স্বরূপা। অতএব এই অমায়িকী ভাগবতী প্রীতির অনুশীলনই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা অখণ্ড স্বরূপা হইয়াও নিজ আলম্বনস্বরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তারতম্যে স্বয়ংও তারতম্য-স্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। গুণোৎকর্ষতারতম্যেই এই প্রীতির নামান্তর ভেদ সূচিত হয়। একমাত্র প্রীতিই—

(১ম) রতিরূপে—ভক্তের হৃদয় উল্লাসিত করেন।

(২য়) প্রেমরূপে—মমতা দ্বারা চিত্তসংযুক্ত করেন।

(৩য়) প্রণয়রূপে—বিশ্রম্ভিত করেন।

(৪র্থ) মানরূপে—প্রিয়ত্বের আতিশয্যে অভিমান জন্মান।

(৫ম) স্নেহরূপে—চিত্ত দ্রবীভূত করেন।

(৬ষ্ঠ) রাগরূপে—স্ববিষয়ের প্রতি অভিলাষ আতিশয্য উৎপাদন করেন।

(৭ম) অনুরাগরূপে—স্ববিষয়কে প্রতিক্ষণই নব নবরূপে অনুভব করান।

(৮ম) মহাভাবরূপে—অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদিত করেন।

এক্ষণে এই সকল বিষয় আরও একটু পরিস্ফুটরূপে বিবৃত করা যাইতেছে। প্রথমতঃ রতি কাহাকে বলে? উল্লাসমাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিকা প্রীতিই রতি নামে অভিহিতা। ইহার অপর নাম ভাব।

"প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।" তন্ত্রে।

উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ যেমন ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলা যায়। অথবা যে অবস্থায় কৃষ্ণানুশীলন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচি দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়, সেই অবস্থার নামই ভাব। এই ভাব বা রতি হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে তদেক-তাৎপর্য্য এবং অন্যত্র-তুচ্ছতাবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

২য়। প্রীতি মমতাতিশয্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয়। এই প্রেম-পারিজাতের বিমল-সৌরভে হৃদয়-কুঞ্জ সুরভি হইলে চিত্ত-ভৃঙ্গ চিরদিনের তরে তাহাতে উন্মাদিত রহে। ইহাই প্রেমের বিশ্ববিজয়ী প্রভাব। এই মমতা-মণ্ডিতা প্রীতির লক্ষণ বিষয়ান্তরেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"মার্জ্জার-ভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহ কুক্কুটে।
ন তাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কে ন মূষিকে॥"

বিড়াল গৃহপালিত কুক্কুট বা কপোত ভক্ষণ করিলে মমতাজনিত যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, একটী ক্ষুদ্র চটকপক্ষী বা ইন্দুর ভক্ষণ করিলে সেরূপ দুঃখ হয় না। কারণ, তাহাদের প্রতি মমতা নাই। এস্থলে এই মমতান্বিতা প্রীতিকে কদাচ প্রেম বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহা ভগবৎ-তাৎপর্য্যশূন্যা—লৌকিকী। অপিচ প্রেমভক্তিতে ভক্তির মুখ্যকারণ নির্দ্দেশস্থলে মমতারই ভক্তিত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ ইত্যাদি শ্লোকই উহার প্রমাণ।

৩য়। বিশ্রম্ভ অর্থাৎ প্রগাঢ় বিশ্বাসাত্মক প্রেমই প্রণয় নামে অভিহিত। যথা—

"প্রাপ্তায়াং সংভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং।
তদ্গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টো রতিঃ প্রণয় উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে রতিতে স্পষ্টরূপে সংভ্রমাদির যোগ্যতা-প্রাপ্তি ঘটিলেও তাহাতে যদি সম্ভ্রমলেশস্পর্শ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রণয় বলা যায়।

(৪র্থ)। প্রিয়তার আতিশয্যে অভিমানের উদয় হইলে কৌটিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক যাহা ভাব-বৈচিত্র্য ধারণ করে, সেই প্রণয়ের নামই মান। উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত হইয়াছে -

"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

স্নেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়া যখন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং কৌটিল্যভাব ধারণ করে, তখন তাহা 'মান' নামে অভিহিত হয়।

মানের উদয় হইলে নিখিল-ভয়হারী শ্রীভগবান্ও সেই প্রণয়-কোপ হেতু ভয়কে ভজনা করেন।

(৫ম)। চিত্ত-দ্রবাতিশয়াত্মক প্রেমই স্নেহ। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের আভাসমাত্রেই মহাবাষ্পাদি বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে এবং প্রিয়তমকে প্রাণভরিয়া দর্শন করিয়াও— তাঁহার সেই অসমোর্দ্ধ রূপামৃত অহরহ পান করিয়াও নয়ন-চকোরের তৃপ্তি হয় না। যথা—

"আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু॥"

যে প্রেম পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া চিৎরূপ দীপের দীপন হয় অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহার নাম স্নেহ। স্নেহ উদিত হইলে কদাচিৎ দর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তি হয় না।

(৬ষ্ঠ) অভিলাষাতিশয়াত্মক স্নেহের নাম রাগ। যথা—

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু যে স্থলে চিত্ত-মধ্যে অতিশয় দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয় তাহার নাম রাগ।

রাগের উদয়ে নিমিষের বিরহও একান্ত অসহ্য; প্রিয়তমের মিলনে পরম দুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়, বিচ্ছেদে পরম সুখও মূর্ত্তিমান দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়।

(৭ম) অনুরাগ; যথা,—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"

যে রাগ স্ব-বিষয়কে অর্থাৎ প্রিয়জনকে অনুক্ষণ নব নব ভাবে অনুভূত করাইয়া স্বয়ং নবীভূত হয়, তাহার নাম অনুরাগ।

অনুরাগের স্ফূর্ত্তিতে পরস্পর বশীভাব, প্রেম-বৈচিত্ত্য, এবং প্রিয়জন সম্বন্ধীয় অপ্রাণীতেও জন্ম-লালসা জন্মিয়া থাকে। এমন কি, উহা বিপ্রলম্ভেও কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে।

(৮ম) অনুরাগ অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা সহকারে উন্মাদক হইলে মহাভাব নামে কথিত হয়। ইহাই শ্রীরাধিকার অনুরাগের আশ্রয়তত্ত্বের অবধি।

"মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।"

রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অধিরূঢ় ভাব আবার দ্বিবিধ। মোদন ও মাদন। মোদন হইতেই দিব্যোন্মাদ এবং হ্লাদিনীর সার প্রেম যখন সর্ব্বভাবোদ্গম দ্বারা উল্লসিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই মাদন নামক পরাৎপর ভাবের

উদ্গম হয়। কৃষ্ণ-প্রেমৈকপ্রাণা শ্রীরাধাতেই এই ভাবের নিত্য-বিকাশ হয়। শ্রীরাধা ভিন্ন ত্রিজগতে অন্য কাহারও এ ভাবে অধিকার নাই।

এই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের যে সকল সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিচার, দৃষ্টান্ত ও প্রকারভেদ আছে, তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে এক বিপুল ব্যাপার। বাহুল্য ভয়ে তাহা এস্থলে আলোচিত হইল না। যাঁহারা এই সকল উজ্জ্বল প্রেমরসতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণে একান্ত অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে "শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি" প্রভৃতি রসগ্রন্থের আলোচনা একান্ত বিধেয়।

সেই আনন্দরস-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ই জীবের একান্ত প্রেমের আস্পদ! অনুরাগের পুষ্পাঞ্জলী দিয়া তাঁহাকে ভজনা না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হন না। তিনি আনন্দরস-স্বরূপ, সুতরাং আনন্দের বিনিময়েই তাঁহাকে লাভ করা যায়, আনন্দচিন্ময়-রসের সাহায্যেই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়, কেন না তিনি আনন্দ-পরাধীন।

শ্রুতি বলেন—

"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন-সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দঘন শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দৈকরসরূপা ভক্তিতেই অবস্থিত। শ্রীভগবানের এই আনন্দঘন মূর্ত্তি অর্থাৎ মূর্ত্তানন্দরূপই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি বলেন—

"কৃষ্ণস্য তাদৃশী মূর্ত্তির্ভক্তিযোগে চ তিষ্ঠতি॥"

ভক্তির দিব্যনেত্রেই এই আনন্দ-মূর্ত্তির সন্দর্শন ঘটে। ভক্ত-

হৃদয়ের প্রীতি-উপহার লাভ করিয়াই শ্রীভগবান্ ভক্তের একান্ত বশীভূত হইয়া পড়েন। তাই, ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—

"সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈ রবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যে কুরুতে রতিম্।
এক স্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়ো স্বহৃদ্॥"

আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তের প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হই, অজিত হইয়াও ভক্তগণের দ্বারা বিজিত এবং অবশ্য হইয়াও তাহাদের দ্বারা বশীকৃত হইয়া থাকি। অতএব যাহারা আত্মীয় বন্ধুজনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাতেই অনুরাগ স্থাপন করেন, আমি কেবল তাহাদেরই হই, সুতরাং ভক্তগণ ভিন্ন আমার অন্য কেহ আর সুহৃদ্ নাই।



তৃতীয় উল্লাস

সম্বন্ধ বিচার।

জড় জগতে যেমন কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা জলীয় পরমাণু বায়বীয় পরমাণু হইতে ভিন্ন, বায়বীয় পরমাণু যেমন তৈজস পরমাণু হইতে ভিন্ন, সেইরূপ চিজ্জগতেও পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন। এই চিদ্গত বিশেষভাব দ্বারা ভগবান্ ও শুদ্ধ জীবগণের মধ্যে যে কেবল নিত্যভেদই স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে, একটি অচ্ছেদ্য নির্ম্মল সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। জীবের সাংসারিক সম্বন্ধ যেরূপ পঞ্চবিধ, সেইরূপ জীব ও শ্রীভগবানেও পঞ্চবিধ সম্বন্ধ-বন্ধন সূচিত হয়। যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। অনেকে মনে করেন,— অলৌকিক সম্বন্ধ লৌকিক সম্বন্ধ হইতে একান্ত পৃথক্ বোধ হইবে, কিন্তু তাহা নহে। লোক, অলোক হইতে বিসদৃশ নহে। এই লৌকিক সংসার ভগবৎ সংসারেরই প্রতিরূপ—সেই অলৌকিক সংসারেরই ছায়া মাত্র। ছায়া যেমন কায়ার অনুরূপই হয়, ইহাও তদ্রূপ। তবে উভয়ের মধ্যে বিভেদ এই ভগবৎ-সংসার অপ্রাকৃত, জীবের সংসার প্রাকৃত। এই ভেদ থাকিলেও জীবের প্রাকৃত সংসার হইতে অপ্রাকৃত সংসারে প্রবেশের এক সুন্দর দ্বার আছে। তাহা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। ইহারই নাম **ভক্তি**। জীব এই ভক্তির সাহায্যেই সেই অপ্রাকৃত সংসারের সহিত এই প্রাকৃত সংসারের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই প্রাকৃত সংসার হইতে ভগবৎ-সংসারে প্রবেশ

করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তিই জীবের প্রধানতম অবলম্বন, ভক্তিই জীবের চরম আশ্রয়।

উল্লিখিত পঞ্চবিধ ভাব-বন্ধন বা রসের মধ্যে কোন্ কোন্ রসের সম্বন্ধে সাধকের কিরূপ ক্রমোৎকর্ষ লাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

১ম। শান্তরসাশ্রিত জীবে প্রীতি কেবল চিত্তের উল্লাস-বিধায়িনী রতিরূপে অবস্থিতি করে। ব্রহ্মজ্ঞান এই রসেই পর্য্যবসিত অর্থাৎ জীবের সংসার-দুঃখের অবসান হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান হয়। ইহাতে কিঞ্চিৎ ব্যতিরেক সুখ ব্যতীত কোন স্বাধীন ভাব লক্ষিত হয় না এবং পরব্রহ্মেব সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধও স্থাপিত হয় না।

২য়। দাস্য রস হইতেই সম্বন্ধের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহাতে মমতা ভাবাত্মিকা প্রীতি 'রতি ও প্রেম' এই উভয় লক্ষণে ভূষিতা হয়। সুতরাং শান্তরসের সমস্ত সম্পদ ইহাতে বিদ্যমান থাকে। মমতাই সম্বন্ধ-বন্ধনের রজ্জু। ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁহার নিত্য দাস,—এই নিত্য সম্বন্ধ থাকাতেই দাস্যরসাশ্রিত সাধক, প্রভুর পরিতুষ্টি বিধানের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য দাস্যরস, শান্তরস অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

৩য়। সখ্যরস,—ইহার প্রণয় পর্য্যন্ত অধিকার। ইহাতে ভয়-বিহীন বিশ্বাস কর্ত্তৃক মমতা দৃঢ়ীভূতা হইয়া থাকে। দাস্যে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক আছে, সখ্যে সম্ভ্রম অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। দাসগণেব মধ্যে যিনি সখা, তিনিই এই দাস্য-রসের অধিকারী। ইহাতে শান্ত ও দাস্যের সকল গুণই বিদ্যমান আছে।

৪র্থ। বাৎসল্যরসে স্নেহ, ভাব পর্য্যন্ত প্রীতির দ্রবময়ী গতি। ইহা সখ্যরস হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা. পুত্রের ন্যায় প্রিয়সখা ও আনন্দদায়ক আর কেহ নাই। সুতরাং শান্ত, দাস্য ও সখ্য এই ত্রিবিধ রসের গুণই ইহাতে অবস্থিতি করে।

৫ম। মধুর রসে যে কান্তা-কান্ত ভাব উদিত হয়, তাহাতে উল্লিখিত ৪টী রসের গুণ ত' থাকেই, পরন্তু মান, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত একত্র মিলিত হয়। সুতরাং—

"তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥ চৈঃ চ

পিতা-পুত্রে কি মাতা পুত্রে বা বন্ধু বান্ধবের বা প্রভু ভৃত্যের সহিত অনেক কথা গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না। অতএব সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমিত হইবে, মধুর রসে পূর্ব্বগত সমস্ত রসই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই মধুর রসে স্বকীয় ও পরকীয় নামে দুইটী ভাব আছে। শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে ভজনাকে স্বকীয় ভাব কহে। ইহা বিধি-প্রবর্ত্তিত। সুতরাং ইহার অন্তর্ভূত প্রেম যেন সীমাবদ্ধ। আর ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দকে উপপতি ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ভজনার নাম পরকীয় ভাব।

"পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাই বাস॥"

পরকীয় ভাবের অন্তর্গত প্রেম অদম্য—ধর্ম্মাপেক্ষা ও লোকাপেক্ষা-শূন্য। কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজললনাগণই এই ভাবের অধি-

কারিণী। সুতরাং এই পরকীয়ভাব-প্রসূত প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় ব্রজধাম ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। গোপিকাদের এই প্রেম সম্পূর্ণ কামগন্ধহীন হইলেও উহাতে কামতুল্যতা লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় কামাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যথা—গৌতমীয়তন্ত্রে—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।"

কাম—স্বচ্ছাসামান্যাত্মক, সুতরং কেবল আত্মসুখতাৎপর্য্যময়। প্রেম বিষয়ানুকূল্যাত্মক, সুতরাং কেবল কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যময়। এই জন্যই শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন –

"কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমপ্রেমবতী ব্রজরামাগণের মিলনে যে আসক্তি বা শুদ্ধা প্রীতির চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা প্রকৃত কাম নহে, মহাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, শ্রীরাধামাধবের এই অপ্রাকৃত রমণলীলা আনন্দময় প্রেম-লীলাবিশেষ। উহাতে কামের কণাভাসও পরিলক্ষিত হয় না। বরং শ্রদ্ধাসহকারে, ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাবিলাস শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে পরাভক্তির পরিস্ফুরণে কামরূপ হৃদ্রোগের আশু শান্তি হয়, মদন-দর্প নির্জ্জিত হয় – হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের লহরী খেলে।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগ মাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভাঃ

সুতরাং ব্রজবধূদিগের যে কাম, উহাই পরম প্রেম; নতুবা উহার দ্বারা কিরূপে কামকর্দ্দম নিধৌত হইতে পারে? পঙ্ক

দ্বারা কি পঙ্ক ধৌত করিতে পারা যায়? না, স্বয়ং অস্নেহ হইয়া অন্যকে স্নেহের অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত করিতে পারা যায়?

মধুর রসে শান্তাদি চারিটি রসের ধারা মিলিত হওয়ায় গুণাধিক্যে উহার স্বাদাধিক্য সূচিত হয়। তাই, শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন —

"গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে ॥"

ইহার দার্শনিক দৃষ্টান্ত এই যে,—

"আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥"

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ ভূতের গুণ যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আকাশের গুণ কেবল শব্দ, বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ আছে এবং নিজের গুণ স্পর্শও আছে। সেইরূপ অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ আছে, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আছে এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণই বিদ্যমান। এইরূপ মধুর রসেও শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই ৪টী রস ত আছেই, পরন্তু নিজের প্রেমরসও উহাতে বর্ত্তমান। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাশোকে কাতর হইয়া বলিয়াছেন—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া চ ধাত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা,
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে ॥"

হে লক্ষ্মণ! আমার প্রিয়তমা সীতা কার্য্যে মন্ত্রীর ন্যায়, কার্য্যসাধনে দাসীর ন্যায়, ধর্ম্মে পত্নীর ন্যায়, শয়নে বেশ্যার ন্যায় এবং রঙ্গে সখীর ন্যায়। কান্তা-প্রেমের প্রাণোন্মাদিনী কমনীয় কাহিনী আনন্দ-চিন্ময়রস-বিভাবিতা ব্রজসুন্দরীগণের জড়াতীত প্রেমের গাথা জড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। ইহা শুদ্ধচিত্তে অনুভবের সামগ্রী। জড়-দর্শন-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মবিচার, উহার কণামাত্র স্পর্শ করিতেও অসমর্থ।

অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ এই শান্তাদি মধুর পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ রসের প্রীতিময় সম্বন্ধ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধকের একান্ত বশীভূত হন। সাধকের প্রীতিভেদে প্রিয়তমেরও ভেদসূচিত হয় এবং তজ্জন্য স্বস্ব ভজন-প্রণালীরও ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে; এই প্রীতিভেদে শ্রীভগবানের কিরূপ ভেদ প্রতীত হয়, তদীয় শ্রীমুখেই পরিব্যক্ত হইয়াছে—

"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥" শ্রীভাঃ

আমিই সেই ভক্তগণের সম্বন্ধে প্রিয়—কান্তা আত্মা – পরমাত্মা, সুত— পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রাদি-অনুজাদি রূপ, সখা—প্রণয়ক্রীড়া-সহচর, গুরু – পিত্রাদিরূপ, সুহৃদ্— নিরুপাধি-হিতকারী, দৈব - আশ্রয়নীয়, এবং ইষ্ট।

ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, প্রেমই জীবের নিত্য প্রয়োজন। প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এই প্রেমেরও যে ক্রমোৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ আছে, তাহা উল্লিখিত শান্ত্য-দাস্যাদি পঞ্চরস-বিচারে প্রদর্শিত হইল। ব্রজধাম ভিন্ন অন্য কোন ধামে

এ প্রেমের বিকাশ দৃষ্ট হয় না এবং নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীভগবানের অন্য কোন স্বরূপ মূর্ত্তি এই প্রেমের বিষয়াবলম্বন হইতে পারে না।

আমাদের করুণাময় প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর যদি এই মধুর প্রেমের ধর্ম্ম জগতে প্রকটন না করিতেন, তাহা হইলে মোহমুগ্ধ কলির জীব এই প্রেমের আভাস পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত কি না সন্দেহ। করুণাময় ঠাকুর এই দুর্লভ প্রেমধন, সাধন-কাঙ্গাল কলির জীবের জন্য অতি সুলভ করিয়া দিয়াছেন। তাই বলি ভাই, যদি এই ভুলোক-দ্যুলোক-দুর্লভ প্রেম-রত্নহার হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাও—যদি অনন্ত সুখশান্তির মধুময় ক্রোড়ে জীবন জুড়াইতে চাও—তাহা হইলে প্রেমাবতার প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরনিতাইয়ের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হও। তোমার প্রেমলাভ সহজেই সিদ্ধ হইবে। তাই, কোন সিদ্ধ ভক্ত গাহিয়াছেন -

"প্রেম প্রেম কর সবে প্রেম কি দেখেছ ভাই।
প্রেমের মুরতি আমার গৌরাঙ্গ নিতাই॥"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পর্য্যন্তই বেদান্তের চরমসীমা। শান্তরসেই সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মজিজ্ঞাসার আরম্ভ দাস্যপ্রেম হইতে। শান্তে কৃষ্ণনিষ্ঠতা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের সেবা নাই। দাস্যেই প্রেমভজনের আরম্ভ। সখ্য-বাৎসল্য ইহার ক্রমবিকাশ এবং মধুর রসেই ইহার পরিণতি। মনুষ্য সাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর চিত্ত ভগবদুন্মুখ হইলেই হৃদয়ে

ভক্তির যে প্রথম বিকাশ হয়, উহাই শান্তরতি ক্রমে যতই নৈকট্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরসে চিত্তবৃত্তি পরিপুষ্ট ও প্রফুল্ল হইতে থাকে। সাধনার ক্রমোৎকর্ষেই ভজনের এই উচ্চতমভাবগুলি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। এক এক শ্রেণীর ভক্ত, এক একপ্রকার ভাব লইয়াই ভজনা করিয়া থাকেন। সকলভাবই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। এইরূপ সাধন-ক্রমের উৎকর্ষেই পরিশেষে সাধক, সাধনার পরাবধি কান্তাভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রজদেবীগণের ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণভজনই সাধ্যতত্ত্বের অবধি। তন্মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। ইহাই প্রেমতত্ত্বের উচ্চতম আদর্শ।



চতুর্থ উল্লাস।

প্রেমের বিষয়—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

—:*:—

বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকে না। যাঁহার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত হয়, তিনিই প্রেমের বিষয় এবং যে আধারে প্রেমের বিকাশ হয়, উহাই প্রেমের আশ্রয়। জীব-হৃদয়ই প্রেমের আশ্রয়। প্রেমের গুণোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিষয়, সেই উপাস্য তত্ত্বেরও ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব, নারায়ণত্ব ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ব্রজপ্রেমই যখন সাধ্যাবধি, তখন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরই সেই প্রেমের বিষয়। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অন্য কোন স্বরূপে এ উজ্জ্বল প্রেমতত্ত্বের বিকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব হইলেও সাধক নিজের অধিকার অনুসারে কর্ম্মযোগে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম ও ভক্তিযোগে ভগবান্‌রূপে দর্শন করেন এবং ব্রজরসলোলুপ প্রেমিক ভক্তগণ সেই পরতত্ত্বকেই প্রেমযোগে গোলোকের প্রাণধন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করেন। রসের আস্বাদ—আনন্দের অনুভূতি রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভব। কেন না, তিনি পরমানন্দমূর্ত্তিতেই ব্রজে অবতীর্ণ।

"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্।"

অহো! ব্রজবাসিদিগের কি সৌভাগ্য! তাঁহারা পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছেন।

কর্ম্মকাণ্ডের কর্কশ ঊষরক্ষেত্রে এই পরমানন্দরসের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব, জ্ঞানকাণ্ডের বা ব্রহ্মকাণ্ডের শুষ্ক পাষাণভূমিতেও এই

আনন্দরসতত্ত্বের পীযূষ-প্রবাহ প্রবাহিত হয় না। ভক্তিকাণ্ডেও এ আনন্দ সহসা সুলভ নহে। কেবল প্রেমকাণ্ডেই সেই অখণ্ড আনন্দতত্ত্বের বিকাশ হয়। শ্রুতি বলেন—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥" মুণ্ডকে।

যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রতিভাত হন, সাধুগণ তাঁহাকে প্রেমভক্তি যোগে দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তত্ত্বের পূর্ণ মাধুর্য্য-বিকাশ। সুতরাং জীবের সর্ব্বোত্তম উপাসনার বিষয়। শ্রুতি বলেন—

"কৃষ্ণ এব পরোদেব স্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং
ভজেত্তং যজেদিতি।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহাতেই রতি করিবে, তাঁহাকেই ভজনা করিবে, তাঁহাকেই যজনা করিবে। এস্থলে সংশয় হইতে পারে শ্রীভগবান্‌কে কেবল শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই উপাসনা করিতে হইবে? কি অন্য কোন স্বরূপেও তাঁহার উপাসনা বিহিত হইতে পারে? তদুত্তর এই যে,—

"কৃষ্ণ এব পরোদেবঃ সর্ব্বেশ্বরো ন তু শিতিকণ্ঠাদিরিত্যর্থঃ।"

পরদেব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর, শিব-ব্রহ্মাদি কেহই সর্ব্বেশ্বর নহেন। তিনি বিভু—বিজ্ঞানানন্দ বস্তু হইয়াও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযশোদার স্তন পান করিয়াছেন। ইহাই কৃষ্ণ-স্বরূপের বিশেষত্ব। 'কৃষ্ণ' শব্দ রূঢ়ার্থে কেবল তমাল-শ্যামল শ্রীযশোদা-দুলালকেই নির্দ্দেশ করে। যথা—

"তমাল শ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদা স্তনন্ধয়ে।
পর ব্রহ্মণি কৃষ্ণ শব্দস্য রূঢ়িরিতি।"

যদি বলেন, পরব্রহ্ম-অবধারণের সরসতা নিবন্ধনই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। কেবল কৃষ্ণ রূপেই উপাসনা করিতে হইবে, শ্রীরামাদি রূপে উপাসনা হইবেনা, এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় উক্ত সংশয় সহজেই নিরস্ত হইতেছে। সুতরাং উপাসকের অধিকার ও রুচি অনুসারেই পরব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—

"যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভি শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥
চতুঃশব্দো ভবেদেকো হোঙ্কারস্যাংশকৈঃ কৃতঃ॥"

প্রণব অ+উ+ম+৺ এই শব্দ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াও যেমন এক, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিভু—সর্ব্বব্যাপক হইয়া, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণীর সহিত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা সমাহিত হইয়াও একইরূপে অবস্থিত। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলরামাদিরও উপাস্যত্ব প্রতীত হইতেছে। সুতরাং কেবল কৃষ্ণই উপাস্য, তাঁহার কায়ব্যূহ কি পরিকরাদি উপাস্য নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। অতএব "কৃষ্ণ এব পর দেবঃ" এই শ্রুতিবাক্যে যে 'এব' শব্দ, ইহা অবধারণার্থ প্রযুক্ত হয় নাই। দেবতান্তরের শ্রেষ্ঠত্ব নিরসন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার প্রতিবন্ধক দূর করাই এস্থলে 'এব' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। ফলতঃ শক্তি ও রুচি থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ-পরিকরাদির উপাসনাতেও কোন দোষ হয় না। সামর্থ্য না থাকিলে কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই বিহিত।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় স্বরূপ শক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া ভজনা করা যায় না। "শক্তিঃ শক্তিমতরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদতত্ত্ব। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তির সারমূর্ত্তি শ্রীরাধা পরস্পর অভেদ-তত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরব্রহ্ম। সচ্চিৎরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দ-রূপিণীই শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব। কেবল লীলা-রস-বিস্তারের জন্যই দুইরূপে প্রকাশ। শৃঙ্গাররসময় প্রেমের চরমাবধি কেবল এই শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বেই পর্য্যবসিত। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব এই প্রেম রসতত্ত্বে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব হইতে ভিন্ন নহে—উহা শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বেরই পরিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণই যে পূর্ণ-ভগবান্, একথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত। শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্ণ ভগবত্তা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদিতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যপাঠিদিগের নিকট একথা অতি পুরাতন। সুতরাং সংক্ষেপেই এই তত্ত্বের আলোচনা উপসংহার করা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥"

অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ কেহ বা তাঁহার কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ, কৃষ্ণ পরম মহত্ত্ব ॥"

ভগবান্ শব্দের অর্থ কি? "ভগ" শব্দের উত্তর 'বতু' প্রত্যয় করিয়া ভগবান্ শব্দ নিষ্পন্ন। ভগবৎ-সন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে—

"সংভর্ত্তেতি তথাভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থ স্তথা মুনেঃ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

অর্থাৎ 'ভগ' শব্দের ভ-কারের দুইটী অর্থ সংভর্ত্তা অর্থাৎ স্বভক্তগণের পোষক ও ভর্ত্তা অর্থাৎ ধারক ও স্থাপক এবং 'গ'কারের অর্থ তিনটী; নেতা অর্থাৎ স্বভক্তি-ফল স্বরূপ প্রেমের প্রাপক, গময়িতা—স্বলোক-প্রাপক ও স্রষ্টা অর্থাৎ স্বভক্তগণের তত্তৎ গুণোৎপাদক। আরও 'ভগ' শব্দে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্গুণের সমষ্টিকে বুঝায় ঐশ্বর্য্য—বশীকারিত্ব, বীর্য্য মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, যশ কায়-মনোবাক্যের সদ্গুণ-খ্যাতি, শ্রী—নিখিল সম্পৎ, জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা এবং বৈরাগ্য—প্রপঞ্চবস্তুতে অনাসক্তি। এই ষড়্গুণের সমষ্টি যাহাতে বিদ্যমান, তিনিই 'ভগবান্' পদবাচ্য। অথবা ভক্তি-বিভাবিতচিত্ত সাধুগণের অন্তরে বাহিরে ইন্দ্রিয়-গোচরে শক্তি-শক্তিমানের ভেদবৈচিত্র্যে যে আনন্দময় তত্ত্বের সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ভগবান্ নামে অভিহিত। ইহাই ভগবৎ শব্দের দার্শনিক তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণই এই আনন্দ তত্ত্ব। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই, ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন তাহারই সারমর্ম্ম এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

উক্ত শ্লোকে কৃষ্ণ এই পদ বিশেষ্য, অপর পদগুলি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও ধর্ম্ম নির্দ্দেশক বলিয়া কৃষ্ণপদের বিশেষণ। শ্রীভগবানের কৃষ্ণ নামই মুখ্যতম। প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

'নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।"

সমস্ত নামের মধ্যে আমার (শ্রীভগবানের) কৃষ্ণ নামই মুখ্যতম।

আবার ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একা বৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥"

পুণ্যতম সহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফললাভ হয় একবার শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের যে গোবিন্দ নাম দৃষ্ট হয়, উহা মাধুর্য্যভাব-দ্যোতক বিশেষণ মাত্র। আবার গুণ দ্বারাও কৃষ্ণ নামের প্রাধান্য সূচিত হয়।

কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি; যথা - মহাভারতে—

"কৃষি র্ভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ।
কৃষ্ণস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ ॥"

অর্থাৎ 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ সত্তা, ও 'ণ' প্রত্যয়ের অর্থ নিবৃত্তি,

এই উভয় যোগে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদীয় ভাবযোগেই ভক্তগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, সুতরাং—

"কর্ষতি আত্মসাৎ করোতি, আনন্দত্বেন
পরিণময়তীতি মনো ভক্তানামিতি যাবৎ
যঃ সঃ কৃষ্ণঃ।"

যিনি ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক আনন্দের দ্বারা পরিণমিত করিয়া আত্মসাৎ করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

গৌতমীয় তন্ত্রে, উক্ত হইয়াছে—

"কৃষশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময় স্ততঃ॥"

কৃষ শব্দের অর্থ সত্তা, ও ণ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ স্বরূপ। আত্মাই সুখস্বরূপ ও আনন্দময়। অতএব কৃষ্ণ শব্দ, আনন্দময় পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

শ্রীভাগবত এই পরব্রহ্মকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গম্।"

পরম ব্রহ্মই গূঢ় হইয়া মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন?—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষদেহমাশ্রিতঃ।"

ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি? বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।"

যিনি বৃহৎ ও নিত্যবৃদ্ধিশীল তাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র বলেন—

"কৃষি শব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্মচোচ্যতে।"

কৃষি শব্দ সত্তার্থ ও ণ শব্দ আনন্দস্বরূপ। এই সত্তা ও আনন্দের যোগে যে 'চিৎ' শব্দের উদয় হয়, উহাই পরব্রহ্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। এস্থলে 'সত্তা' শব্দ, যাহা হইতে সকল সতের প্রবৃত্তি এবং যাহা সেই সতের হেতু সেই পরম সৎকে বুঝাইতেছে। শ্রুতি বলেন —

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি।"

অর্থাৎ হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিল।

গৌতমীয় তন্ত্রে কৃষ্ণ শব্দের আর একটী সুন্দর অর্থ বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরং জঙ্গমং।
কালরূপেণ ভগবাং স্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে॥"

যিনি কালরূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎকে আকর্ষণ করেন তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। 'কাল' শব্দের অর্থ—যিনি সকলকে কলিত অর্থাৎ নিয়মিত করেন। তাপনী শ্রুতি বলেন—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয়, বশী, সর্ব্বজ্ঞ ও স্তবনীয়। এইজন্য তিনি ঈশ্বর, সুতরাং পরম। পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা অন্তরঙ্গা শক্তি ও মা—লক্ষ্মীরূপা শক্তিসমূহও যাহাতে বিদ্যমান তিনিই পরম। তাই, শ্রুতি বলেন—

"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং।"

শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব। সুতরাং তিনি আদি। আবার তিনি

অনাদি অর্থাৎ তিনি যে আদি-পুরুষ, তাঁহার আর আদি নাই। অতএব তিনি সর্ব্বকারণের কারণ। জগতের কারণ স্রষ্টা, তাঁহারও কারণ। যথা—

"যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি লয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিংগতা॥"

ভাঃ ১০।৮৫।৬১

হে বিশ্বাত্মন্! তোমার অংশ পুরুষ, তাঁহার অংশ মায়া, মায়ার অংশ গুণসমূহ, উহাদের অংশভাগ পরমাণু দ্বারাই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ হইয়া থাকে এবম্ভূতরূপ যে তুমি, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে কেবল অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেরই উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নহে; তিনি নিখিল অবতারের বীজ স্বরূপ এবং তাঁহার অংশের অংশ দ্বারা দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যকনরাদয়ঃ॥"

সূর্য্য যেমন স্বীয় কিরণ সমূহের আশ্রয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার নিখিল অবতারের আশ্রয় স্বরূপ ও বীজ স্বরূপ। অসংখ্য অবতার তাঁহা হইতে প্রসূত হইলেও তিনি অব্যয়; সুতরাং নিত্য পূর্ণতম। তাঁহার অংশের অংশ দ্বারাই দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি সৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম।"

তাই বেদান্ত-দর্শন বলেন—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, তিনিই আনন্দময় পরব্রহ্ম। তাই, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"আনন্দ ব্রহ্মেতি, কো হ্যেবান্যৎ আনন্দাদ্ধীমানি
ভূতানি জায়ন্তে।"

অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম, অপর কেহ নহে। আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূতের জন্ম হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে—

"ন তস্য কার্য্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাশ শক্তি র্বিবিধৈব শ্রুয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥"

তাঁহার কার্য্যও নাই, কারণও নাই, তাঁহার সমানও নাই, তাঁহার অধিকও নাই; তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপ বিবিধ পরাশক্তির কথা শ্রবণগোচর হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সকল বাক্যে এই সংশয় হইতে পারে, আনন্দ যখন সাকার পদার্থ নহে, তখন আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে সাকার বলা যাইতে পারে? তদুত্তর এই যে. শ্রীকৃষ্ণ কেবল আনন্দময় নহেন তিনি আনন্দ-বিগ্রহ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বই তাঁহার নিত্যস্বরূপ। যথা তাপনী ও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—

"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে" ॥ ইতি।

শ্রীকৃষ্ণ অক্লিষ্টকারী ও সচ্চিদানন্দ রূপ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।"

সৎ, চিৎ, আনন্দের মধ্যে 'সৎ'শব্দে অব্যভিচারী সত্য বুঝায়। শ্রীভাগবতে ১০ম, স্কন্ধে ব্রহ্মাদি দেবগণের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং।"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনাতে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সাধন এবং আপনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তকালে সত্য স্বরূপ।

প্রলয় সময়ে যখন নিখিল ভূত-প্রপঞ্চ আদি ভূতে বিলীন হয়, পরে সেই ব্যক্ত আদিভূতও কালবশে অব্যক্তে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন একমাত্র পরব্রহ্মই অবশেষ থাকেন। তাই, গীতায় শ্রীভগবান্ ঘোষণা করিয়াছেন –

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি।"

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তাপনী শ্রুতি বলেন –

"জন্ম জরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয় মচ্ছেদ্যোঽয়ং
যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু
তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ
গোপেষু তিষ্ঠতীত্যাদি।"

তিনি জন্ম-জরার অতীত ও অচ্ছেদ্য, তিনিই স্থাণু, যিনি সৌর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্যপুত্র শ্রীযমুনার অদূরে শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করেন, যিনি কামধেনু প্রভৃতি গোসমূহের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া গো-সমূহ পালন করেন এবং যিনি এই গোপগণের মধ্যে অবস্থান করেন।

অনন্তর 'চিৎ' শব্দের অর্থ এই যে, যিনি স্বপ্রকাশ হইয়াও পর-প্রকাশক, তাঁহার নামই চিৎ। তাপনী শ্রুতি বলেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ণং যো বিদ্যা
স্তস্মৈ গাঃ পায়য়তি স্ম কৃষ্ণঃ হৃদেবমাত্ম
বৃত্তি প্রকাশং মুমুক্ষু বৈ শরণমমু ব্রজেদিতি ॥"

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা নিহিত করেন। মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ সেই আত্মবৃত্তি-প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্রুতিতে আরও উক্ত হইয়াছে—

"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

ইহার রূপ প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা পরিদৃষ্ট হয় না, তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন বা যাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়েন, তিনিই দর্শন লাভ করিতে পারেন। যেহেতু শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন।

জ্ঞানের সাধনে যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন, তাহা এই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ং।"

ভক্তিই জ্ঞানের পরাবস্থা। সুতরাং জ্ঞানী ব্রহ্মবাদিদিগের নিকট এই অদ্বয় তত্ত্ব নিরাকার হইলেও ভক্তের ভক্তি-বিভাবিত প্রেমের চক্ষে তিনি সর্ব্বদাই ভুবনমোহন শ্যামসুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদেব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণ-প্রকাশং
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

সুতরাং ভক্তিতত্ত্বের বিকাশেই ভগবত্তত্ত্বের বিকাশ হয় এবং ভগবত্তত্ত্বের বিকাশেই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়।

'সচ্চিদানন্দ' পদোক্ত আনন্দ শব্দের অর্থ এই যে, সর্ব্বাংশে নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদই আনন্দ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্।"

আপনি কেবল অনুভব দ্বারা অনুভূত আনন্দস্বরূপ এবং সকলের জ্ঞানগোচর। পরন্তু শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্।"

আনন্দই ব্রহ্মের রূপ।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্।"

বিজ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই যজমানের কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন।

"বিগ্রহ" শব্দ আত্মাকে বুঝায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। তাই, শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণমেন মবেহি তমাত্মান মখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী ভাবাতিমায়য়া॥"

শ্রীকৃষ্ণকেই নিখিল জীবের আত্মা বলিয়া জানিবে। জগতের হিতসাধনার্থ নিজ মায়ায় ইনি জীবের ন্যায় প্রকাশিত হয়েন। অতএব তাঁহার যে দেহীর ন্যায় লীলা দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার কৃপাপরবশতারই নিদর্শন। এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ 'লীলা'।

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য লীলায় শ্রীনন্দনন্দন ও গোবিন্দ নামে অভিহিত এবং উজ্জ্বলরসতত্ত্বে 'শ্রীগোপীজনবল্লভ' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

এই শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা। যথা—

"গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জন স্তত্ত্বসমূহকঃ।
অনয়ো রাশ্রয়ো ব্যাপ্তা কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥
সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতি র্বল্লভেন চ কথ্যতে।
অথবা গোপী প্রকৃতি র্জন স্তদংশমণ্ডলঃ॥
অনয়ো র্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ।
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভি স্তেন গীয়তে॥
অনেক-জন্ম-সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রৈলোক্যানন্দ বর্দ্ধণঃ॥"

"অর্থাৎ 'গোপী' শব্দের অর্থ প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া নাম্নী জগৎকারণ শক্তি। 'জন' শব্দের অর্থ-তত্ত্ব-সমূহের পূরক পুরুষ,—এই প্রকৃতি-পুরুষের আশ্রয় ও কারণ রূপে যিনি ব্যাপ্ত তিনিই ঈশ্বর। "বল্লভ" শব্দে সান্দ্রানন্দ পরম জোতি কথিত হইয়া থাকেন। অথবা 'গোপী' শব্দে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াতীত বৈকুণ্ঠাদি ধামে স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী প্রভৃতি এবং 'জন' শব্দে অংশ-

মণ্ডল অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাদিকে বুঝাইয়া থাকে। 'বল্লভ' শব্দে ইহাদেরই স্বামী কথিত হইয়া থাকেন। এই 'গোপীজনবল্লভই' কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। শ্রুতি ইঁহাকেই কার্য্য-কারণের অধিপতি বলিয়া থাকেন।

তবে যে তাঁহাকে বাসুদেব বলা হইয়া থাকে, উহা বসুদেব হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনই বটেন।

"আবিবেশাংশ ভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।"

সর্ব্ব-গূহাশয় ভগবান্, আনকদুন্দুভি বসুদেবের মনে অংশত প্রবেশ করিয়া ছিলেন। অতএব বাসুদেবরূপে অংশত প্রকাশ পূর্ণতমস্বরূপে ব্রজেশ্বরের পুত্ররূপে উদিত হইয়া ছিলেন।

শ্রীনন্দরাজের এই যে আত্মজ-জ্ঞান, ইহা পিতৃভাবময় শুদ্ধ বাৎসল্যরস-ব্যঞ্জক মহাপ্রেমেরই কারণ। বসুদেবেও ঐরূপ বাৎসল্যভাব বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তাহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নিবদ্ধ থাকায় ব্রজরাজের মাধুর্য্য-ভাবদ্যোতক শুদ্ধ বাৎসল্যভাব অপেক্ষা অনেকাংশে হীনপ্রভ। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্ "

বেদ-পুরাণ-ভারত-ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে এইরূপ সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল বেদেই শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিদর্শন স্বরূপ ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যথা—

"ওঁ কৃষ্ণং ত এম রুশতং পুরো ভাশ্চরিষ্ণ্বর্চি—
র্বপুষামিদেকং যদপ্রবীতা দধতে হ গর্ভং
সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীহ দূতঃ।"

(অন্বয়ার্থঃ।—কৃষ্ণং এম প্রাপ্নুয়াম, যস্য রুশত রোচমানস্য পুরোভাঃ পুরস্তাদ্দীপ্তিঃ ভবিতা। চরিষ্ণু সঞ্চরণশীলম্ অর্চ্চিঃ বপুংষা বপুষ্মতাম্ একম্ ইৎ এব যৎ যং তাং অপ্রবীতা নাস্তি প্রকর্ষেণ বীতং গমনং যস্যাঃ সা নিগড়িতা দেবকী—"কৃষ্ণায় দেবকী-পুত্রায়েতি" ছান্দোগ্যে পঞ্চম প্রপাঠকে দেবক্যা এব কৃষ্ণমাতৃত্বদর্শনাৎ গর্ভং হ দধতে ধারয়তি। সত্যশ্চিৎ সত্যঃ এব ইহ জাতঃ আবির্ভূতঃ সন্ দুতঃ মাতুর্বিয়োগাদ্দুঃখপ্রদঃ ভবতি।)

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি, তিনি পুরোভাগে—দীপ্তিমণ্ডল-মণ্ডিত, তিনি সঞ্চরণশীল তেজের ন্যায় অদ্ভুত শরীর ধারণ করিয়া দ্বিতীয় শরীরী হয়েন, নিগড়িতা দেবকী তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করেন। ছান্দগ্যে শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টই 'দেবকীপুত্র' বলা হইয়াছে। তিনি দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত, হইয়া ব্রজে গমন পূর্ব্বক জননীর সম্বন্ধে বিয়োগ-দুঃখপ্রদ হয়।

আবার অথর্ব্ব-সংহিতার দ্বিতীয় প্রপাঠকে পঞ্চমানুবাকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্টই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"নক্তং জাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ ॥"

হে ঔষধে! অর্থাৎ বৈষ্ণব-দাহ-শমনি যোগমায়ে! তুমি শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবের পর তাঁহাদিগের তরুণী অনুজা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

—আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ পরম উৎকর্ষও বেদে উক্ত হইয়াছে। ঋক্-পরিশিষ্টে কথিত হইয়াছে—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে।"

অর্থাৎ সেই চিন্ময় বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ও মাধবের সহিত শ্রীরাধিকা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীভগবানের দ্বিভুজ নরাকারতা বেদে স্পষ্ট প্রতীত হয়। যথা—যজুর্ব্বেদে ৫ম, অধ্যায়ে—

"দিবো বা বিষ্ণো উত বা পৃথিব্যা মহো বা
বিষ্ণু উরো রন্তরাক্ষাৎ উভা হি হস্তা।
বসুনা প্রণদ্বা প্রযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ
বিষ্ণবে ত্বা।"

হে বিষ্ণো! স্বর্গ, পৃথিবী বা বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান ধনের দ্বারা নিজের উভয় হস্ত পূর্ণ কর এবং দক্ষিণ বা বামহস্ত দ্বারা আমাদিগকে ধনদান কর, তোমাকে প্রণাম।

দ্বিভুজত্বই নরাকারতা; সুতরাং জগৎ-কারণ পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ নিত্য নরাকৃতি। ইহাতে ব্রহ্মবাদিদের নির্ব্বিশেষ নিরাকারতার বিতণ্ডা সহজে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত দৃষ্টি-গ্রাহ্য না হইলেও সত্য ও নিত্য। বিজ্ঞানবলে জড়-পদার্থের সম্যক্ তত্ত্ব যখন উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, তখন জড়াতীত চিন্ময়-রাজ্যের যাবতীয় বিষয় কিরূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইতে পারে? যেহেতু, আমাদের জড়ীয় জ্ঞানের পরিধি অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; সুতরাং সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ তত্ত্ব কিরূপে অবগত হইতে পারি? কিন্তু জ্ঞানের ক্রম-বিকাশে পদার্থ উপলব্ধির সীমাও ক্রমশ সুবিস্তৃত হয়, ইহাই স্বাভাবিক। আমরা যেখানে চক্ষুর সাহায্যে কিছুই দেখিতে পাইনা, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টি করিলে সেখানে অসংখ্য প্রাণীর সঞ্চালন-ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইবে। যেখানে কোন শব্দ শুনা যায় না, 'মাইক্রোফোন্' নামক যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে কল্লোল-কোলাহলবৎ শব্দ

তরঙ্গ শ্রুতিগোচর হয়। সেইরূপ সাধনার প্রভাবে সাধকের যতই প্রজ্ঞাশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ততই তাহার অলৌকিকী দৃষ্টির উন্মেষ হয় এবং সেই দিব্য-দৃষ্টিবলে প্রেমিক-সাধক প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত নয়নে সেই পরব্রহ্মের শ্রীআনন্দমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব তাহা দর্শন করা দূরে থাক, ধারণাতেও আনিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন —

"তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব
প্রধ্বস্ত মায়াগুণভেদ মোহৈঃ ॥
সনন্দনাদ্যৈ মুনিভির্বিভাব্যং
কথং বিমূঢ় পরিভাবয়ামি ॥"

হে ভগবন্! তুমি জ্ঞান-ঘন অর্থাৎ সত্যজ্ঞানানন্দৈকরস-মূর্ত্তি। তোমার শ্রীমূর্ত্তি আমার ন্যায় মন্দবুদ্ধিজনের কোন প্রকারেই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। আমি মূঢ়, কি প্রকারে তোমার ভাবনা করি। তুমি জ্ঞান-ঘন হইলেও আমার ন্যায় মূঢ়ের জ্ঞানের বিষয় নহ। আমি মায়ামুগ্ধ, কি প্রকারে তোমার সেই তত্ত্বজ্ঞান অনন্ত আনন্দময় রসমূর্ত্তির ভাবনা করিতে সমর্থ হইব? তোমার শ্রীমূর্ত্তি জ্ঞানাতীত হইলেও অতি সত্য। ভক্তি-কৌমুদীর বিমল-প্রভায় যাহাদের মায়াগুণাত্মক মোহ-তিমির বিদূরিত হইয়াছে সেই সনক-সনন্দাদি মুনিগণ অনুক্ষণ তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দলাভ করিয়া থাকেন।

সূর্য্যের প্রকাশ উলুকের নিকট অজ্ঞাত হইলেও কি চক্ষুষ্মান্ প্রাণীর নিকট উহার প্রকাশগুণের উপলব্ধি হয় না? অতএব —

"ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥

*　　*　　*　　*

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

অতএব শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত নয়নগোচর না হইলেও কর্ম্মযোগে তাঁহার অনুভূতি, জ্ঞানযোগে তাঁহার জ্যোতি দর্শন এবং ভক্তিযোগে অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব ও দর্শনলাভ হয়, সুতরাং পরতত্ত্বকে যাঁহারা একবারেই নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং শ্রীমূর্ত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদেরও ভাবিয়া দেখা উচিত, তাহারা কি অনন্ত-অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন পরতত্ত্বকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় সংবদ্ধ করিতেছেন না কি? তিনি নির্ব্বিশেষ হইয়াও যদি সবিশেষ হইতে না পারেন, নির্গুণ হইয়াও যদি সগুণ না হইতে পারেন কি নিরাকার হইয়াও যদি সাকার না হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকে কই?

"অহং বহুস্যাম্"- তিনি এক হইয়াও যখন বহু হইয়াছেন, তখন তাঁহার স্বরূপশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাবে বিশ্বব্যাপকরূপে প্রতি-ষ্ঠিত থাকিয়াও প্রপঞ্চে বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিতে পারেন। তাই, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে —

"বত আবভূব অস্থূলো স্থূলোঽনণু রণুরমধ্যমো
মধ্যমোঽব্যাপকো ব্যাপকো হরিরাদিরনাদি-
র্ব্বিশ্বো বিশ্ব সগুণো নির্গুণঃ॥"

অতএব এক অখণ্ডানন্দ তত্ত্বই সাধনার সাধনার বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন—

"উপাসনা ভেদাদ্দর্শনভেদঃ। মাধ্বভাষ্য।

এই জন্যই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎ-সরোজে
আস্সে শ্রুতোক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

হে নাথ! তুমি ভক্তিযোগপরায়ণ সাধুগণের হৃদয়-সরোজে তাঁহাদের বিভাবনা অনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া থাক।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহ আনন্দময়, প্রাকৃত মানবীয় দেহের ন্যায় জড়বস্তু নহে। মানবের ন্যায় হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইলেও আনন্দ-চিন্ময়স্বরূপ, তাঁহার ত দেহ-দেহী বিভেদ নাই। শ্রুতি বলেন—

"বয়ং শ্রুতয়ঃ ভগবন্তমেবাচিন্ত্য স্বানুবন্ধিশক্ত্যা
বুদ্ধ্যাদিমন্তং মন্যামহে।"

আমরা শ্রীভগবান্‌কে অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তি দ্বারা বুদ্ধিমান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট দেখিয়া থাকি। বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদমজ্জাস্থি-সম্ভবা।"

শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, প্রাকৃতমূর্ত্তির ন্যায় মেদমজ্জাস্থি-সম্ভূত নহে। কিন্তু—

"অবিজ্ঞায় পরং দেহ মানন্দাত্মন মব্যয়ং।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়ং॥"

শ্রীভগবানের দেহ আনন্দময় ও অব্যয়, প্রাকৃতজনগণ উহা বুঝিতে না পারিয়াই পঞ্চভূতাত্মক ও জড়বৎ মনে করিয়া থাকে।

নারদ পঞ্চরাত্র বলেন—

"আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥"

তাঁহার হস্ত, পদ, বদন ও উদরাদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আনন্দ। সুতরাং জড়দেহ ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। এই পূর্ণ পরমানন্দ-বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ।

চিন্ময় তত্ত্বের সকলই চিন্ময়, আনন্দ স্বরূপের সকলই আনন্দ। জলে তরঙ্গ খেলে, কিন্তু সে তরঙ্গ বস্তুতঃ জল ভিন্ন কিছুই নহে। সেইরূপ অখিল-রসামৃত-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে বিবিধ লীলা-লহরী ও আনন্দচিন্ময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান—শ্রীবৃন্দাবন, বংশীবট শ্রীযমুনাতট, নিকুঞ্জকানন প্রভৃতি এবং লীলাসঙ্গিনী ব্রজরমণী প্রভৃতি সকলই আনন্দ-চিন্ময়রসের প্রকট মূর্ত্তি। শ্রীবৃন্দাবন—অনন্ত প্রেমসিন্ধুর আনন্দলহরী। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

যাহারা শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত প্রেমের লীলাকে—এই প্রেমসাধনার চরম আদর্শকে অশ্লীলবোধে উড়াইয়া দিতে চাহেন তাঁহার যে ঘোর ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ কি?

চিন্ময়-রাজ্যের অচিন্ত্য—তর্ক-জ্ঞানের অগোচর প্রেমতত্ত্বকে বুঝাইবার উপযোগিনীভাষা বা আদর্শ এ জড়-জগতে একান্ত দুর্লভ! কাজেই ঐ অনাবিল প্রেমতত্ত্বকে বুঝাইতে বা বুঝিতে হইলেই জড় মানবীয় প্রেমের মধ্য দিয়াই জড়ীয় ভাষায় বুঝাইতে ও বুঝিতে হইবে। এই জন্যই এই ব্রজলীলা প্রাকৃত ব্যক্তির নিকট প্রেম-সাধনার চরম আদর্শ না হইয়া এক দূষনীয় ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীবৃন্দাবন-লীলাগাথা যদি জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থপ্রদ ও পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা না হইয়া যদি অশ্লীলই হয় তাহা হইলে শ্রীশুকদেবের ন্যায় নিত্যমুক্ত ঋষি, পবিত্র জাহ্নবীতীরে আসন্ন-মৃত্যু রাজা পরীক্ষিতকে উহা শুনাইবেন কেন?

সে যাহা হউক শ্রুতিতে এই উজ্জ্বল প্রেমতত্ত্বের কোন উল্লেখ আছে কি না, বিচার্য্য। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

"তদ্ যদা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন
বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তর মেবায়ং পুরুষঃ
প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন
বেদ নান্তরং তদ্ বা অস্যৈ তদাপ্তকাম
মাত্মকাম মকামং রূপং শোকান্তরম্।"

অর্থাৎ প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সম্যক্ প্রকারে আসক্তি-বন্ধন হইলে জীবের যেমন অন্তর ও বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ কান্তাকান্ত বা মধুর ভাবে প্রজ্ঞাত্মা শ্রীভগবানের সহিত অনুরাগ-বন্ধন হইলে জীবের অন্তর-বাহ্য কোন জ্ঞানই থাকেনা, স্ত্রী-পুংভাব নিরস্ত হইয়া যায়। তখন—

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥"

এই অকৈতব প্রেম-পরৈক্যভাব উপস্থিত হয়। ভক্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যখন শ্রীভগবানে সম্পরিষ্বক্ত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হন তখন ভক্ত ও ভগবান্ এই উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নায়ক-নায়িকা বা স্ত্রী-পুরুষ ভাব থাকে না। ইহাই ভক্তের আত্মকাম আপ্তকাম, অকাম ও শোক-রাহিত্য।

শ্রুতিতে এই যে মধুর প্রেমতত্ত্ব বীজরূপে নিহিত, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় এই বীজই উজ্জ্বল পরকীয় রস-সিঞ্চনে দিগন্ত-প্রসারী মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। মোহান্ধ ত্রিতাপদগ্ধ কলির জীব জ্বলিয়া পুড়িয়া এই প্রেম-কল্পতরুর শীতল-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই প্রেমানন্দ লাভে ধন্য হইতেছেন।

অতএব আনন্দই জীবের আত্মা, আনন্দই জীবের লক্ষ্য—মূর্ত্তানন্দ সন্দর্শনই বৈষ্ণবের একমাত্র সাধনা। আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিই শ্রীবৃন্দাবনের ভজনীয় বস্তু। কিন্তু উজ্জ্বল রসতত্ত্বের উচ্চতম সাধনায় এই আনন্দময় মূর্ত্তিই শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিরূপে প্রেমিকের আরাধ্য হইয়া থাকেন।

"রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সেই রস অস্বাদিতে কৈল অবতার॥
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।"

এতএব— * * *

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।"

শ্রীকৃষ্ণের এই যে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপ, ইহাই মদনমোহন রূপ। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ না হইলে কি তিনি উজ্জ্বল প্রেমের বিষয়

হইতে পারেন? যে মদনের তাড়নায় জীবের চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয়—শ্রীকৃষ্ণও যদি মদন-রাজ্যেরই প্রজা হন, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষত্ব, তাঁহার প্রেমের আদর্শত্ব থাকে কই? এবং কেমন করিয়া তিনি নিষ্কাম প্রেম-ভজনের উপাস্য দেবতা হইবেন? তাই, রাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন আনন্দচিন্ময়-রস-বিভাবিতা গোপীকা-দিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন তখন তিনি—"পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বীসাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।

প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভেদে মন্মথ অনেক আছেন। তদীয় শক্ত্যংশের আবেশরূপ প্রাকৃত মন্মথগণ সাক্ষাৎ মন্মথ নহেন। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহে যে সকল মন্মথ আছেন তাঁহারাই সাক্ষাৎ মন্মথ। কিন্তু এই যে শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ইনি সেই মন্মথগণেরও মনোমোহন স্বরূপ। ইনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন এই আকর্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি—শ্রীকৃষ্ণ।

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥

পুষ্পিত-মঞ্জু-কুঞ্জ-শোভি-শ্রীবৃন্দাবনে এই যে নবনটবর শ্যাম সুন্দর, ইনি অপ্রাকৃত নবীন মদন। ইনিই প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল কন্দর্পের নিদান। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"কালিন্দী-পুলিনাঙ্গণ প্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরম্।

এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী উক্ত অভিনব মদনরূপের চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—শ্রীবৃন্দাবনের অভিনব কন্দর্প প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল কন্দর্পাবতারের অঙ্কুর স্বরূপ অর্থাৎ প্রথমোদ্ভিন্ন কোমল স্কন্ধাংশ। সুতরাং সকল কন্দর্পেরই নিদান। ইহাই তাঁহার নারীমনোহারিত্বের কারণ। চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নাদি ইহার শাখাস্থানীয় ইহারাই অপ্রাকৃত মদন। ইহার অংশ লেশাভাসরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রাকৃত মদনগণই উহার পত্র স্থানীয়। আগমাদিতে কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবনের কোটীকন্দর্পবিমোহন শ্রীমদন-গোপালরূপে তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আজও তিনি শ্রীবৃন্দাবনে সহজ মধুর লাবণ্যামৃত-পারাবার ও মহানুভাবগণের মহাভাব-নিবহে অনুভূয়মান শ্রীশ্রীমদনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সংপাদৈকং ন গচ্ছতি।"

শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্পই কৈশোরে শ্রীমদন-গোপাল এবং যৌবনোদ্ভিন্নে শ্রীমদন-মোহনরূপে সাধকের ভাবনা-পদবীতে নিত্য অনুভূয়মান হইয়া থাকেন। তাই পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বন্দে মদন-গোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতং।
যমাহু যৌবনোদ্ভিন্নে শ্রীমন্মদন-মোহনম্।"

কেবল মহাভাব-নিবহ দ্বারাই এই মদনমোহনরূপের অনুভব সম্ভবপর। ইনি কেবল মাদন মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার সম্ভোগের পাত্র। মাদন-মহাভাব কাহাকে বলে?—হ্লাদিনীর

সার প্রেম, সেই প্রেম যদি সকল প্রকার ভাবোদ্গমে উল্লাসশীল হয় তবে, তাহাকে মাদন বলা যায়।

এই মাদনাদি মহাভাব নিবহের আস্বাদ্য মাধুর্য্যামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। কামবীজ ও কামগায়ত্রীর বিচার-বিশ্লেষণ পরে সাধনতত্ত্বে বিবৃত হইবে।

ব্রজরসের ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইলে এই শ্রীমদনগোপাল মূর্ত্তিই একমাত্র আরাধ্য ও ধ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য, গুণ-মাধুর্য্য, নাম-মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ইত্যাদি অনন্ত মাধুর্য্যামৃতের পারাবারের কণাভাস কোটীকল্পেও বর্ণনা করা যায় না। উক্ত মাধুর্য্যসিন্ধুর বিন্দুমাত্র হৃদয়ে প্রকটিত হইলেই সাধক চিরতরে আনন্দরসে অভিষিক্ত হন।

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥"

অতএব এই মাধুর্য্যামৃতের কণামাত্র আস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ হইলেই সাধকের জীবন চিরতরে মধুময় হইয়া যায়, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট মধুময় বলিয়া অনুভূত হয়, তখন সাধক প্রাণের অধীর আবেগে প্রার্থনা করেন—

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ওঁ মাধ্বী নঃ সন্ত্বোষধী মধু নক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ওঁ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমন্নো বনস্পতি মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।"

অর্থাৎ বায়ু সকল মধু বহন করুক, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক,

আমাদের ওষধি সকল মধুফল প্রদান করুক, রজনীসমূহ মধুরূপ ধারণ করুক, ঊষা মধুময়ী হউক, পার্থিব ধূলিসমূহ মধুময় হউক, আকাশ মধুযুক্ত হউক, আমাদের পিতা মধুমান্ হউন, বনস্পতি ও সূর্য্য মধুমান হউন এবং আমাদের গো-গণ মধুময় ক্ষীর প্রদান করুক।

প্রেমসাধনার পরিপাক দশায় সাধকের হৃদয়ে এই আনন্দময়ী মধুবর্ষিণী নিত্যলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সিদ্ধ দশায় তিনি আনন্দময়ের মধুময় প্রেমের রাজ্যে নিত্যলীলা-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া অনন্ত আনন্দরসাস্বাদন করিতে থাকেন।



পঞ্চম উল্লাস

জীব-তত্ত্ব।

জীব স্বয়ং জড়াতীত চিৎস্বরূপ পদার্থ, সুতরাং ত্রিগুণাত্মক জড় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূর্য্যের বহিশ্চর কিরণ-কণার ন্যায় পরম-চিদেক রসময় শ্রীভগবানের বহিশ্চর চিৎ-পরমাণু স্বরূপই জীব। অতএব—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণা॥"

শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীভগবান্ জ্বলন্ত অগ্নিরাশি, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গের কণা স্বরূপ। সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে ভিন্নবোধ হয় এবং অগ্নিরাশি হইতে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের যেমন পৃথক্ সত্তা অনুভূত হয়, অথচ বস্তুতত্ত্বে কিরণ সূর্য্য হইতে এবং স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে,—সেইরূপ পূর্ণ-চিৎস্বরূপ শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশই জীবপদ বাচ্য। জীব—অণু, ভগবান্—বিভু, জীব—সেবক, ভগবান্—সেব্য, জীব—মায়াধীন, ভগবান্—মায়াধীশ। সুতরাং জীব ও ভগবানে বস্তুগত কোন ভেদ অনুমিত না হইলেও ধর্ম্মগত পার্থক্য নিত্য পরিদৃষ্ট হয়, এই যে জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ,—ইহা অচিন্ত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপনের নিমিত্ত এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞানের এক সূক্ষ্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। স্পর্শমণি নিত্য শতভার সুবর্ণ প্রসব করিয়াও

যেমন কোন বিকার প্রাপ্ত হয় না, সূর্য্য নিত্য অজস্র কিরণ-ধারা বর্ষণ করিয়াও যেমন অবিকৃত থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি হইতে নিখিল জীবের সৃষ্টি হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। চিৎশক্তির পরিণাম বৈকুণ্ঠাদি ধামে লীলার সহায়—চিৎ-কণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামেই জড়-জগৎ এবং জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহ। অতএব শ্রীভগবান স্বীয় সৃষ্টি মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র পূর্ণ শক্তি-পরিসেব্য স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে নিত্য বিরাজ করেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ স্থির হয়। জীব অণু হইতেও অনীয়ান্, শ্রীকৃষ্ণ মহান্ হইতেও মহীয়ান্। ক্ষুদ্র, বৃহতের উপাসনা করে, ইহাই জগতের নিয়ম। অসংখ্য নদনদী মহা-সাগরেব উদ্দেশ্যেই প্রবাহিত হয়, এই জন্যই ক্ষুদ্র জীব, বিভু শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের এই যে, নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, ইহারই নাম ভক্তি বা প্রেম। তাই, শ্রুতি বলেন—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা ॥" বৃহদারণ্যক।

অর্থাৎ সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও প্রিয়, অন্য সকল বিষয় হইতে অন্তরতর প্রিয়।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস,—এই আত্ম-স্বরূপের ভ্রম, এবং কৃষ্ণ-স্বরূপের ভ্রম উপস্থিত হইলেই জীব এক অনর্থের গভীরতম কূপে নিপতিত হয়, এই অনর্থই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার কারণ। মায়া তাহার দূতী স্বরূপা। যে হেতু, জীব মায়া-বিমোহিত হইয়া আপ-নাকে জড় দেহাদিসম্বন্ধীয় বলিয়া মনে করে এবং পুনঃ পুনঃ

ঐ মনন জন্য সংসার-বাসনাদিরূপ অনর্থ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মায়াই জীবের এই অনাদি সংসার-বাসনার একমাত্র কারণ। তাই, শ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-শিক্ষায় বলিয়াছেন -

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত্ অভেদ॥"

এইবাক্যে জীবের উপর মায়ার কর্তৃত্ব ও ঈশ্বরের ঔদাসীন্য স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। শাস্ত্র বলেন—

"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।"

অর্থাৎ মায়া যাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনিই ঈশ্বর এবং যিনি মায়া-পিশাচীর কবলে নিরন্তর পেষিত হইতেছেন, তিনিই জীব; সুতরাং জীবের উপর মায়ার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিপথে এই মায়া বিলজ্জিতা হইয়া অবস্থান করেন।

মায়ার জীব-সম্মোহন কার্য্য শ্রীভগবানের প্রীতিকর নহে। সেই জন্য কপটিনী মায়া নিজের এই জীব-সম্মোহনরূপ কপটতা জানিয়া শ্রীভগবানের নিকট আগমন করিতে লজ্জা বোধ করেন। সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করেন। অতএব ভগবানের পশ্চাতে দূরে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবদ্বিমুখ জীবের দেহাদিতে অভিনিবেশ দ্বারা স্বরূপ আচ্ছাদন এবং স্মৃতি-বিপর্য্যায় ঘটাইয়া জীবকে সংসার-দুঃখভোগ করানই মায়ার কার্য্য।

জীব ও মায়া উভয়ই শ্রীভগবানের শক্তি। জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি এবং মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজের ন্যায় শুদ্ধ চিন্ময়রূপিণী।

তটাস্থাশক্তি জীব -তাঁহার রশ্মি-স্থানীয় বলিয়া অণু-পরিমাণে শুদ্ধ চিন্ময়রূপিণী। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি উহার প্রতিচ্ছবি স্থানীয়া এবং ভগবানের বহিরঙ্গ-বৈভব। সুতরাং জড়ময়ী। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তাঁহাতে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ পরা ও অপরা সকল শক্তিই মিলিতভাবে অবস্থান করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তি যুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৭।৩

আপনি বাক্য ও মনের অগোচর রূপদ্বারা অখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য; যে হেতু আপনি চিৎশক্তি (বিদ্যা) ও অচিৎ (অবিদ্যা বা মায়া) এই উভয় শক্তি মিলিত। এই জন্যই শ্রুতি বলেন—

"তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি।"

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"

একদেশস্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চারিদিগে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ পরমব্রহ্মের শক্তি সমূহও এই অখিল জগৎ-পরিব্যাপ্ত।

সৎ, চিৎ, আনন্দ এই ত্রিতয়াত্মিকা শক্তির সাধারণ নাম স্বরূপ শক্তি। এই স্বরূপশক্তির প্রতিচ্ছায়াই মায়াশক্তি। জীব তটস্থা শক্তি; স্বরূপশক্তিও নহেন বা মায়াশক্তিও নহেন। মায়া কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া জীব স্বরূপশক্তি হইতে পারেন না; আবার মায়া-পরিচ্ছন্ন জীব মায়াও নহেন। সুতরাং অণু

চৈতন্যই জীবের স্বরূপ। অণুশক্তি বিরাট বিভু-শক্তিকে বা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বকে কিরূপে জানিতে পারিবে? ধূলিকণা কি গিরিরাজ হিমালয়ের সহিত তুলিত হইতে পারে?—না তাহার মহত্ত্ব সম্যক্ বিদিত হইতে পারে? জীবের অণুত্ব হেতু ভগবৎ-সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা স্বাভাবিকী। অজ্ঞতার প্রাবল্যেই জীবের ভগবদ্-বৈমুখ্য উপস্থিত হয়। এই বৈমুখ্যসূত্র ধরিয়াই মায়াশক্তি জীবে সঞ্চারিত হইয়া পরস্পর আবরণ দ্বারা জীবকে আবৃত করিয়া ফেলে।

দেশ, কাল ও পাত্রভেদে মায়ার ত্রিবিধ আবরণ। তন্মধ্যে দেশ ও কালরূপা মায়ার নাম জৈবী মায়া এবং বস্তুরূপা মায়ার নাম গুণময়ী মায়া। জৈবীমায়া কারণাত্মিকা এবং গুণময়ী মায়া—কার্য্যাত্মিকা। এই সকল মায়ার আবরণই, এই মায়ার রাজ্য-সংসারে জীবের আত্মবিপর্য্যয়ের মুখ্য কারণ। জীবের নিত্যস্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইলে অর্থাৎ "আমি কৃষ্ণদাস," বা কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ও অংশী, আমি তদীয় আশ্রিত ও অংশবিভূতি—এই তত্ত্ব, জীব স্বভাবতঃ বিস্মৃত হইলেই মায়াধীন হইয়া থাকে।

"জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস যবে ভুলি গেল।
মায়া-পিশাচী তার গলায় বেড়িল ॥"

যদি বল, শ্রীভগবান্ করুণাময়, তবে তিনি কেন জীবের এই প্রকার মায়ামোহনতা সহ করেন? তদুত্তর এই যে, জীব যেমন তাঁহার শক্তি, মায়াও তদ্রূপ তাঁহারই শক্তি। বিশেষতঃ তাঁহার এই মায়াশক্তি প্রপঞ্চের অধীশ্বরী; সুতরাং তাঁহারই কার্য্যকারিণী সেবিকাতুল্যা। এই কারণেই তিনি মায়ার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রকাশ

না করিয়া থাকিতে পারেন না। অথচ জীবের প্রতিও তাঁহার অপরিসীম করুণা। জীব যাহাতে মায়া-রাজ্যের প্রজা হইয়া, মায়ার কঠিন শাসনে নিপীড়িত না হয়, তাহার জন্য জীবকে সর্ব্বদাই সাবধান করিয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা এমনই দুর্ম্মতি—বিষয় বিতর্কের কর্কশ-কোলাহলে আমাদের শ্রবণ-যন্ত্র এমনই বধির যে আমরা করুণাময়ের সেই স্নেহপ্লুত অভয়বাণী ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। ঐ শুন! করুণাময় অভয়াশীষপূর্ণ আশ্বাস বাক্যে কি বলিতেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" গীতা।

আমার এই মায়া অলৌকিকী, অতি বিচিত্রা, সত্বাদি ত্রিগুণাত্মিকা এবং রজ্জুবৎ সুদৃঢ়া, সুতরাং অচ্ছেদ্যা হইলেও জীব যদি তাদৃশ কোন সৎপ্রসঙ্গক্রমে আমার শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে জীবের আর মায়া-ভয় থাকে না। পরন্তু সে অনায়াসে এই মায়া-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দময় আমাকে প্রাপ্ত হয়।

অতএব জীবের প্রতি শ্রীভগবানের যে অসীম কৃপা তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।

সংসার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ অপরাধী জীবের দণ্ডভোগের জন্য কারাগার। ভগবান্ দয়াময়! জীব ক্লেশ প্রাপ্ত হউক, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। জীবকে দুঃখ-জলধি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই জীবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীব নিজের চেষ্টায় যোগ্যতালাভ করিয়া ভগবানের অনন্তলীলাস্বাদ করুক, ইহার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলে সকলই উদ্ধার

পাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য লীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, ইহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ। অযোগ্যপুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে পিতার অধিকতর আনন্দ হয়। ইহাই ভগবৎ স্নেহের প্রতিফল।

কোন কোন মতে জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জীব কখনই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি বলেন—"অলোহিত মচ্ছায়ম্।"

এই শ্রৌতবাক্যে যখন তাঁহার ছায়াই নিবারিত হইয়াছে তখন জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন বস্তু। শ্রুতি বলেন—

"নিত্যো নিত্যানং চেতন শ্চেতনানামিতি।"

ইহাতে জীবের নিত্যত্ব ও চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফলতঃ পরমাত্মাও জীবের মধ্যে চিৎ-ধর্ম্মাংশে প্রভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। যেমন গৌরবর্ণ বিপ্রের সহিত শ্যামবর্ণ বিপ্রের বিপ্রত্ব ধর্ম্মে ভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত ভেদ থাকে, সেইরূপ জীব ও পরমাত্মার চৈতন্যাংশে ভেদ না থাকিলেও জীব ও পরমাত্মার ব্যক্তিগত ভেদ স্বাভাবিক।

অণু-চৈতন্য জীব মায়ার তরঙ্গে মুহুর্মুহু সন্তাড়িত হইয়া স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব ভুলিয়া গেলেই মায়া-প্রবণ হইয়া পড়ে এবং স্বীয় আশ্রয়-কল্পতরু শ্রীভগবানকেও ভুলিয়া যায়। চেতনধর্ম্মা জীব যে অংশীরূপ চেতয়িতা ভগবানের অংশ, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ইত্যাদি ॥"

শ্রীচরিতামৃতে এই শ্রুতি-বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে —

"কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম, জীবের স্বরূপ বিচারি।"

আবার ভক্তিতত্ত্বের মহোদধি শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।"

ইহাই জীবের স্বরূপ তত্ত্ব। জীব প্রধানতঃ বদ্ধ ও মুক্তভেদে দ্বিবিধ। যতদিন ভগবৎ স্মৃতির উদয় না হয়, কিম্বা স্বীয় নিত্যস্বরূপ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম-স্মৃতির রেখা মানস-পট হইতে মুছিয়া যায় না। সুতরাং জড়-জগতে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই জীবের একটী বন্ধন-ভাব উপস্থিত হয়; এই শ্রেণীর জীব নিত্যবদ্ধ নামে অভিহিত। আর যাঁহারা এরূপ কর্ম্মজালে আবদ্ধ নহেন— তাঁহারাই নিত্যমুক্ত। নিত্য-স্বরূপ স্মৃতি-পথে উদিত হইলেই জীব মুক্তভাব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভগবানের যেমন একটী স্বরূপ-বিগ্রহ আছে, শুদ্ধ জীবেরও সেইরূপ একটী চিন্ময় নিত্যদেহ আছে। জীব মায়া-বদ্ধ হইলেই তাহার সেই চিদ্দেহ প্রথমে মনোময় লিঙ্গাবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। পরে সেই লিঙ্গাবরণ জড়জগতের স্বাধর্ম্ম্যে পাঞ্চভৌতিক জড়ীয় আবরণ বা স্থূলদেহ দ্বারা আবৃত হয়। আত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহে এবং ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে স্থূলদেহে আত্মাভিমান জন্মে অর্থাৎ ঐ স্থূল-সূক্ষ্ম 'দেহাত্মকই আমি' এইরূপ জ্ঞান জন্মে।

জড়ে এই আত্মাভিমানই অহঙ্কার নামে অভিহিত। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি এই তিনটী লিঙ্গ-শরীরের উপাদান। জড়ে অভিনিবেশ বৃদ্ধি হইলে ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত বা মন নামে অভিহিত হয় এবং জড়ে বিচার-বৃত্তির চালনা দ্বারা অহঙ্কারতত্ত্ব আরও স্থূল হইলে বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই তিনটী তত্ত্ব জড়ও নহে জীবও নহে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জন্য লিঙ্গপদবাচ্য। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত স্থূলদেহের উপাদান। মরীচিকায় জলভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম বা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই স্থূলদেহে জীবের তদাত্মভ্রম উৎপন্ন হইলেই জীব নিত্যবদ্ধ নামে কথিত হয়। তখন স্থূলজগতের আহার, বিহার, শারীরিক ক্লেশ ইত্যাদি অনিত্য ধর্ম্ম ভ্রমক্রমে স্বীকার করিয়া সুখদুঃখে অভিভূত হয়। স্থূলদেহ যে সকল কার্য্য করে, লিঙ্গদেহ তাহার ফলসমূহ সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করে। এই দুইটী দেহাবরণ দূর হইলেই জীবের শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পায়। জীব মায়ামুক্ত হয়। ভক্ত-সঙ্গে ভাগবতী কৃপার স্ফুরণ হইলেই জীবের মায়া-মুক্তি সহজে সিদ্ধ হয় এবং নিত্যসিদ্ধ ভাগবতীতনুর বিকাশ ঘটে। মৃত্যুর পর জীবের স্থূল দেহেরই পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে।

বস্তু মাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে। স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ-পরিচয় চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। বদ্ধজীব চিদাভাস স্বরূপ, মায়িক সুখ দুঃখরূপ আনন্দ-বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। ফলতঃ জীব চিদানন্দ-স্বরূপ—চিৎ ইহার গঠন সামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। জীবের চিদ্দেহ, যেরূপ জড়-সঙ্গে ক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলদেহ

দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ জীবের এই আনন্দরূপ স্বধর্ম্ম ও লিঙ্গও স্থূলগত হইয়া দুঃখরূপে পরিণত হয়। এই দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিই সুখরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং সুখদুঃখ উক্ত আনন্দেরই বিকার মাত্র।

অহো! আমারা কি মহা-মোহান্ধ—কি ভ্রান্ত! মায়ার ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া আমরা স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বঞ্চিত হইয়া নিরন্তর তাপত্রয়ে নিপীড়িত হইতেছি!! আমরা কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়াতে কৃষ্ণদাসী মায়াও আমাদিগকে অপরাধী জানিয়া এই সংসার-কারাগারে নিগড়িত করিয়া রাখিয়াছে। বিবিধ আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ-জরা-মরণাদি দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে, তথাপি আমাদের সে ভ্রম বিদূরিত হইতেছে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, আমাদের স্বধর্ম্মবৃত্তি লুপ্ত হইতে পারে না—লুপ্ত হয় নাই। কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত আছে। অনুশীলন দ্বারা তাহা আবার জাগরিত হইবে। অতএব স্বধর্ম্মানুশীলন অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন যে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরমার্থ-সিদ্ধির যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে সে সমুদায় তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। অভিধেয় বিচারে এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে ভক্তিই প্রধান সাধন বলিয়া অভিহিত। আমরা ভক্তিবাদী এবং ভক্তি-সাধনাতেই যখন পরম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দপ্রাপ্তি হয় তখন ভক্তিতত্ত্বই আমাদের সর্ব্বথা অবলম্বনীয় ও সর্ব্বদা আলোচ্য।

ষষ্ঠ উল্লাস

ভক্তিতত্ত্ব।

সাধ্যবস্তু লাভ করিতে হইলেই সাধনার প্রয়োজন। সাধন ব্যতিরেকে কেহ সাধ্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন পথে পরমতত্ত্ব লাভের নিমিত্ত সাধন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ সাধনমার্গই প্রশস্ত। যোগ—কর্ম্ম ও জ্ঞানেরই অন্তর্নিবিষ্ট। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ভক্তিশাস্ত্রে গৌণ-সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তিই ভগবত্তত্ত্ব সাধনার মুখ্যসোপান। ভক্তি-সাধনা ব্যতিরেকে উচ্চতম প্রেমতত্ত্বের অমিয় রসাস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ সুদূরপরাহত। ভক্তি, একটী স্বতন্ত্রবৃত্তি। ইহা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অপেক্ষা করে না, বরং জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিই ভক্তিদেবীর দাসরূপে দূরে দূরে ক্রিয়াপর হয়। সত্য বটে, প্রাথমিক সাধনবলে যে বিবেক বৈরাগ্যাদি উদিত হয়, তাহাতে মুক্তিলাভ পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তির সাধনায় প্রথমেই মুক্তি অবান্তর ফলরূপে স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হয়।

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ॥"

যদি শ্রীকৃষ্ণ-পদে নিবিড় আনন্দরূপা ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তের চরণে মুক্তিরূপ সাম্রাজ্যলক্ষ্মী বিলুণ্ঠিত হইয়া

থাকেন অর্থাৎ ভক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত হয়েন না, বরং মুক্তিই ভক্ত-পদাশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব ভক্তিই সাধন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভক্তিকে দূরে রাখিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানকে মুখ্যসাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু বাস্তবিক উহারা কথঞ্চিৎ ভক্তির গৌণসাধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যথা—

"দান-ব্রত তপো হোম জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥"

শ্রীভাঃ ১০।১৭।

উদ্ধব কহিলেন—দান, ব্রত, তপস্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়-সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তবে এই সকল কর্ম্ম ভক্তির অঙ্গস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উদ্দেশে কৃত হইলেই ভক্তি-উন্মেষক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্যবিধ দানাদি কর্ম্ম দ্বারা ভক্তির বিকাশ অসম্ভব। এই জন্যই শ্রীসনাতন-শিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥"
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥"

আমরা ভক্তিবাদী বৈষ্ণব—ভক্তির নির্ম্মল পথই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয়। বিশেষতঃ কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সাধ্যতত্ত্বের পরাবধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎ সৌভাগ্যলাভ ভক্তির উচ্চতম সাধনা সাপেক্ষ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের

মধুর লীলা-রসাস্বাদন করিতে হইলে গোপীভাব-অনুগতি ভিন্ন আর কোন উপায়ই নাই। ইহা ভক্তি-সাধনার উচ্চতম ক্রম।

এই ভগবদ্বশীকারিণী পরম প্রেমরূপা ভক্তি কাহাকে বলে? ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং সেবনই ভক্তি। তাই, নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

সর্ব্বেন্দ্রিয় সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবনই ভক্তি। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ভক্তির লক্ষণ আরও পরিস্ফুট ভাবে লিখিত হইয়াছে—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

স্বীয় বৃত্তির পুষ্টি ব্যতীত অন্য প্রকার অভিলাষশূন্য, জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্য ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। সুতরাং অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ। কর্ম্মমার্গে যে স্মৃত্যাদি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা নীতি মূলক। সুতরাং উহা মোক্ষের উপায় নহে। কি নিষিদ্ধ কি বিহিত কোন কর্ম্মই মোক্ষপ্রদ হয় না। যেহেতু নিষিদ্ধ কর্ম্ম নরকাদি-ক্লেশ ভোগের নিদান। বিহিত কর্ম্মে তাদৃশ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা না থাকিলেও মোক্ষ সিদ্ধ হয় না স্বর্গাদি ভোগই হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত হইতে পারে। চিত্তশুদ্ধিতেই জ্ঞান শক্তির প্রসারতা এবং জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। এই জন্য কর্ম্ম-যোগ পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষ-সাধক।

কর্ম্মযোগ দ্বিবিধ। সকাম ও নিষ্কাম। নিজের ভোগসুখের জন্য যে কর্ম্ম তাহা সকাম, এবং কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য যে কর্ম্ম বা কৃত

কর্ম্মের ফল কৃষ্ণে সমর্পণ, ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। স্বরূপতঃ ইহা ভক্তি না হইয়াও, ইহাতে ভক্তিভাব আরোপিত হয় বলিয়া "আরোপসিদ্ধা" ভক্তিনামে অভিহিতা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি ইহারই অন্তর্গত। ইহারই অনুশীলনে ভক্তির দিকে চিত্ত কথঞ্চিৎ উন্মুখ হয় বলিয়া এই কর্ম্মামিশ্রা ভক্তি প্রাথমিক বহিরঙ্গ সাধন। শুদ্ধা ভক্তি এই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত।

তারপর যে জ্ঞানযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হন, তাহার অনুশীলন ও ভক্তিশূন্য জ্ঞান স্বরূপানুভব সাধনে অক্ষম। এই জন্য এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে "সঙ্গসিদ্ধা" ভক্তি কহে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির পরেই ভগবদ্বিষয়িণী প্রেমলক্ষণা ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

অতএব কর্ম্ম-জ্ঞানশূন্যা উত্তমাভক্তিই প্রেম-সাধনার প্রধান সোপান। নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানীর যাহা চরম লক্ষ্য তাহার পর হইতেই বৈষ্ণব-সাধ্যের প্রথম সোপান আরম্ভ। তবে, এক্ষণে এই সংশয় হইতে পারে, যদি উত্তমা ভক্তিতে জ্ঞানকর্ম্মের অনুশীলন নিরস্তই হয়, তাহা হইলে সাধন-ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? তদুত্তর এই যে, শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত ভক্তিবাধক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই এইরূপ বাধা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভজনীয়ের অনুকূল পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু সেই সকল কর্ম্ম ভক্তিরই অনুশীলন বিশেষ। তাই, নারদ-ভক্তিসূত্র বলেন—

"সা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগেভ্যোপ্যধিকতরা।"

এই ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা। ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরই ক্রিয়া। এরূপ শক্তির ক্রিয়া স্বরূপশক্তি-রই সম্পত্তি। এই স্বরূপশক্তির ক্রিয়া বা ভক্তিপ্রবাহ কেবল ভক্ত-

সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী সম্প্রদায়ে উহার ক্ষীণাভাসও লক্ষিত হয় না। কারণ, ভক্তি ঐ সকল সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে। কর্ম্মের ফল ভোগ, জ্ঞানের ফল মোক্ষ, এবং যোগের ফল সিদ্ধি। যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, তাঁহারা অশান্ত, তাঁহাদের সাধনদশায় কি সিদ্ধদশায় প্রাণে পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও শান্তির সুধা-প্রবাহ প্রবাহিত হয় না। ভক্তির ফল প্রীতি, ভক্ত প্রীত, সুতরাং ভক্ত প্রেমের অমৃত-আস্বাদে সর্ব্বদাই শান্ত ও পরিতৃপ্ত।

অনন্তর কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের গতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। প্রথমতঃ কর্ম্ম দ্বিবিধ, নিষিদ্ধ ও বিহিত। জগতের যাহা অমঙ্গলকর এবং ইহলোক ও পরলোকে নিজের উদ্বেগদায়ক সেই পাপরূপ কর্ম্মের নামই নিষিদ্ধ কর্ম্ম। নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণে মৃত্যুর পর জীবের প্রথমতঃ প্রেতত্ব লাভ হয়, পরে নরকভোগ ঘটিয়া থাকে।

প্রেতলোকের অধঃপ্রান্তই নরক। সাগর বক্ষঃ হইতে চন্দ্র-লোক পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি পর পর যে সকল সূক্ষ্ম ভূতলকোষ আছে, তাহাদের নাম প্রেতলোক। যাহারা নিষিদ্ধ কর্ম্মাচারী বা বিহিত সকাম কর্ম্মাচারী, মৃত্যুর পর তাহাদের প্রেতাত্মা এই সকল প্রেতলোকে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রেতত্বের অবসান হইলে নরকে, বা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। এই নরকস্থানেব অপর নাম অবীচি,—ইহা পৃথিবীর অন্তর্গত। অবীচিই নরকের নিম্নতম স্থান। উহার উর্দ্ধভাগে আরও ৫টী নরক স্থান আছে। যথা অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিশ্র। এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ উপনরক আছে। এই সকল নরকের উর্দ্ধভাগে

যথাক্রমে মহাতল, রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল ও পাঁতাল এই সপ্তপাতাল লোক আছে। পাতাল সমাপ্ত হইলেই এই পৃথিবীলোকের আরম্ভ সূচিত হয়। নিষিদ্ধ কর্ম্মাচারী অর্থাৎ পাপকর্ম্মাসক্ত পাষণ্ড জীবগণই এই সকল নরক-ভোগের অবসানে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করিয়া কর্ম্মানুরূপ দেহ লাভ করিয়া থাকে। নিষিদ্ধ কায়িক কর্ম্মের ফলে স্থাবর দেহ, নিষিদ্ধ বাচিক কর্ম্মের ফলে তির্য্যগ্‌দেহ এবং নিষিদ্ধ মানস কর্ম্মের ফলে নীচ মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। ইহাই পাপ-কর্ম্মের পরিণাম বা গতি। নরকের ভীষণ পৈশাচিক দৃশ্য ও পাপীর দণ্ড-তাড়নার করুণ-কাহিনী শাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সে সকল কথা শ্রবণ করিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও ক্ষণেকের জন্য আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

জগতের ও নিজের মঙ্গলদায়ক পুণ্যরূপ কর্ম্মের নামই বিহিত কর্ম্ম। ইহা সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। ফল-কামনাযুক্ত কর্ম্মের নাম সকাম কর্ম্ম। ইহা আবার তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা তামস ভাবে বিহিত কর্ম্মাচরণ করেন, মৃত্যুর পর প্রেতত্বাবসানে তাঁহারা বিলস্বর্গে গমন করেন। ভূগর্ভস্থ পাতাল পুরীর নামই "বিলস্বর্গ'। রাজস ভাবে যাঁহারা বিহিত কর্ম্মাচারী, তাঁহাদের ভুবর্লোকে এবং সাত্ত্বিক বিহিত কর্ম্মাচারীদেরই স্বর্গলোকে গতিলাভ হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্র-বিমণ্ডিত অন্তরীক্ষের নামই ভুবর্লোক, এবং সৌর-জগতের পরবর্ত্তী সমস্ত প্রাকৃত লোকের সাধারণ নাম স্বর্গ। এই স্বর্গলোকও উপর্য্যুপরি পঞ্চস্তরে বিভক্ত। প্রথম ইন্দ্রলোক (গৃহীর স্বর্গ), দ্বিতীয় মহর্লোক (ব্রহ্মচারীর স্বর্গ),

তৃতীয় ব্রহ্মলোক বা প্রজাপতিলোক। ইহাও আবার তিনভাগে বিভক্ত; জনলোক (ইহাও ব্রহ্মচারীর স্বর্গ) তপলোক (বান-প্রস্থের স্বর্গ) ও সত্যলোক (সন্ন্যাসীর স্বর্গ) এই লোকেই ব্রহ্মা নিয়ত বাস করেন। উক্ত লোকসমূহে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ।—তামসাদি ত্রিবিধ বিহিত কর্ম্মাচারীরই ভোগান্তে ধরাধামে পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করা যায়। উল্লিখিত ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত-লোকের সমষ্টির নাম ভুবনকোষ। ভুবনকোষের ঊর্দ্ধভাগেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-নিকেতন আনন্দময় শ্রীগোলোক ধাম। সেই শ্রীগোলোক ধামের অন্তঃপুর প্রদেশই নিত্যবৃন্দাবন। সেখানে নিত্য রসের প্রবাহ—নিত্য রাস-লীলা।

কর্ম্মী যত বড় সাধনশীল হউন না কেন, সত্যলোক পর্য্যন্তই তাঁহার গতির সীমা। আবার ভোগান্তে তাঁহারও পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মী স্বর্গ-ভোগের পর যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তখন তিনি যে গুণাশ্রিত, সেই গুণময় জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপেই সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিকী ভক্তির অধিকারীই নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে সাত্ত্বিক জ্ঞানী মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকেন। আবার সাত্ত্বিক ভক্ত ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তি লাভে কৃতার্থ হন।

মুক্ত ও ভক্ত উভয়েরই কর্ম্মবন্ধন নাই। সুতরাং উভয়ই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ জীবকোষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির পারে গমন করিয়া থাকেন। মুক্ত নিজের অস্তিত্ব পরব্রহ্মে মিশাইয়া দিয়া শান্ত হন, ভক্ত আপনাকে ভজনীয় ভগবানের

অধীন করিয়া দিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অনন্ত শান্তিসুখ ভোগ করিতে থাকেন। মুক্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকেন ; ভক্ত অনন্তকাল ব্যাপিয়া প্রেমময়ের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং ভগবৎ কর্ম্মের সহকারী হন। সুতরাং ভক্তের কর্ম্মবন্ধন না থাকিলেও কর্ম্ম-প্রবাহের বিনিবৃত্তি হয় না।

জ্ঞান প্রধানতঃ ত্রিবিধ। ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মা জ্ঞান, ও ভগবৎ জ্ঞান। "সোঽহং" "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" ইত্যাদি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। আমি জীবাত্মা, অন্তর্যামী পুরুষের অংশ, ইহার নাম পরমাত্মজ্ঞান। আমি শক্তি, শক্তিমান্ পরমেশ্বরের শক্তিরই অংশ, এই জ্ঞানের নাম ভগবৎ-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা সদ্যোমুক্তি। পরমাত্মজ্ঞানীর গতি পরমাত্ম-সাযুজ্য বা ক্রমোমুক্তি। ভগবৎ-জ্ঞানী বা ভক্তের গতি ইতঃপূর্ব্বে বিশদ-ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যোগ শব্দে যদিও কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বুঝাইয়া থাকে, তথাপি উহা প্রধানতঃ অষ্টাঙ্গযোগকেই নির্দ্দেশ করে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটী-ক্রিয়া-সমবায়ই অষ্টাঙ্গ-যোগ। ইহা কর্ম্মযোগের ন্যায় জ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়া চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন করে ও মোক্ষফল প্রদান করে। আবার ভক্তির অঙ্গীভূত হইয়া ভক্তিফল প্রেম প্রসব করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ যাহার প্রধান অঙ্গ, এবং ভক্তি যাহার অনুষঙ্গিক তাহার নাম সকাম ভক্তি। ইহার ফল সিদ্ধি ও ভুক্তি। অর্থার্থী ও আর্ত্ত ব্যক্তি-গণই ইহার অধিকারী। আবার ভক্তি যাহার প্রধান অঙ্গ, এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ যাহার আনুষঙ্গিক, তাহার নাম নিষ্কাম

বা সাত্ত্বিক ভক্তি। ইহাও আবার কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা ভেদে ত্রিবিধ। মোক্ষকামী ব্যক্তিগণই ইহার অধিকারী। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই আরোপসিদ্ধা নামে এবং জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তিই সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি নামে অভিহিতা। নারদীয় পুরাণে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, উত্তম, মধ্যম, অধমভেদে ভক্তির ৮১ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে মানসী, বাচিকী, কায়িকী, লৌকিকী, বৈদিকী ও আধ্যাত্মিকী এই ষড়্‌বিধ ভক্তির বিভাগ দৃষ্ট হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও "মাধুর্য্য-কাদম্বিনী" গ্রন্থে উৎসাহময়ী; ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা, ও তরঙ্গরঙ্গিণী নামে ভক্তির বিভাগ করিয়াছেন। এই সকল ভক্তি বিভাগের মধ্যে কেবলা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিই সর্ব্বগরীয়সী। তাঁহার অপর নাম নির্গুণা বা অহৈতুকী ভক্তি। কর্ম্ম জ্ঞানাদি ইঁহার অধীন ও মুখাপেক্ষী। ইনি কাহারও অপেক্ষা করেন না,—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি,—জ্ঞানের ফল মোক্ষ, যোগের ফল সিদ্ধি এবং সেই সঙ্গে নিজের ফল যে ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারাদি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন।

এই শুদ্ধা ভক্তিই সাধ্যফল এবং ভক্তিই তৎফলের সাধন। এই ভক্তির সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি নামে ত্রিবিধ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিই সাধ্যভক্তি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী সাধন ভক্তিই উহার সাধন।



সপ্তম উল্লাস

সাধনভক্তি-বিচার।

সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ। বৈধী ও রাগানুগা। ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ, তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগা যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা নামে অভিহিতা। রাগাত্মিকার দুইটী বিভাগ আছে। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। যাহা কাম বা সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেমে পরিণত করে, তাহার নামই কামরূপা। কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী গোপীগণই ইহার অধিকারিণী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। এই কারণে রাগানুগা ভক্তিও কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে দ্বিবিধ। রাগানুগার আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বৈধীভক্তির নির্মল পথই অবলম্বনীয়। বৈধীভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে সমর্থ না হইলেও উহাই রাগানুগা ভক্তি লাভের প্রধান সহায়। সাধনভক্তির প্রভাবে মায়ার আবরণ তিরোহিত হইলে চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হয় এবং সেই নির্ম্মল চিত্তদর্পণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম স্বতঃই প্রকটিত হইয়া থাকেন। সাধন ভক্তির লক্ষণ কি?—

"কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা বা সাধনাভিধা।
নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

যাহা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-প্রেরণা দ্বারা সাধ্য এবং প্রেম যাহার ফল তাহার নামই সাধন ভক্তি। হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাবের যে প্রকা-

শতা তাহাই এস্থলে সাধ্যতা শব্দের তাৎপর্য্য। নতুবা কৃষ্ণপ্রেম জীবের হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠিত আছে। অজ্ঞানতার আবরণ বশতঃই মায়ামুগ্ধজীব উহা অনুভব করিতে পারে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ক্রিয়াই সাধন ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সুতরাং এই সকল ক্রিয়া সাধন-ভক্তি হইতে অভিন্না। ইহা হইতেই প্রেম উপজাত হয়। প্রেমের এই উপজনন কার্য্যই সাধন ভক্তির তটস্থ লক্ষণ।

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥"

যদিও প্রেম নিত্যসিদ্ধ, উহার সাধন নাই। তথাপি প্রেম-ভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ কতকগুলি সাধন আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

বিষয়াসক্তি ও বিষয়-সঙ্গত্যাগই শুদ্ধ চিত্ততার কারণ। শুদ্ধ চিত্তেই প্রেমের উদয় হয়। যদিও যম, নিয়মাদি অভ্যাসযোগে ও বৈরাগ্য দ্বারা ধীরে ধীরে বিষয়ত্যাগ ও তৎসঙ্গত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির সাধনায় উহা সহজেই সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নামগুণাদি নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তন করিলে তাহাতে যে অভিনিবেশ জন্মে, তদ্দারা বিষয়ের ও তৎসঙ্গের ত্যাগ আপনা হইতেই হইয়া যায়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য আর স্বতন্ত্র সাধনান্তরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না।

আমরা মায়া-বিক্ষিপ্ত বিষয়াসক্ত সংসারী জীব। রাগমার্গের উচ্চতম সাধনায় আমাদের সহসা অধিকার লাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তবে বৈধীভক্তির অভ্যাসে ও সাধনায় চিত্তবৃত্তি

ভক্তিরসে ক্রমশঃ অভিষিক্ত হইলে এবং মায়ার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইলে চিত্তভূমি রাগানুগা ভক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব চিত্তের সহিত প্রতারণা করিয়া ধর্ম্মধ্বজিতা প্রকাশ করা অপেক্ষা বৈধীভক্তি দ্বারা চিত্তসংযম ও চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করাই একান্ত সমীচীন। বৈধী-ভক্তির লক্ষণ। যথা—

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তি রুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে ॥"

শ্রীভগবানে রুচি উৎপন্ন হয় নাই, অথচ শাস্ত্র শাসনভয়ে ভগবৎ সেবায় যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম বৈধীভক্তি। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন।

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তি রিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

হে দেবর্ষে! হরির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই বৈধীভক্তি। এই ভক্তির সাধনাতেই পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সাধনতত্ত্ব-বিচারে প্রেমোদয়ের একটী সুন্দর ক্রম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন-ক্রিয়া অর্থাৎ

প্রাকৃতভক্ত যাহা করিয়া থাকেন, তাহার পর অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ পাপ অবিদ্যাদি দূর হওয়া, ইহাই উক্ত ভজনের ফল। পরে নিষ্ঠা অর্থাৎ একাগ্রতা উৎপন্ন হয়, চিত্ত একাগ্র হইলেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব, এবং ভাব হইতেই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই সাধকগণের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ক্রম।

১। শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধাই বৈধীভক্তির প্রাণ, ইহাই সাধনার প্রাথমিক সোপান —ইহাই ভক্তি-লতার বীজ স্বরূপা। সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। ভগবত্তত্ত্বে ও নিজের ক্ষুদ্রতায় যে বিশ্বাস তাহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। এই শ্রদ্ধা কখন কি ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহা ঠিক্ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাহারও শাস্ত্র বিচার দ্বারা—কাহারও সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশ ক্রমে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। কাহারও বা কর্ম্মে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। জীবের যতদিন কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত ফল-কামনা থাকে, ততদিন তাহার কর্ম্মই প্রীতিজনক হয়। যতদিন কর্ম্মে এই প্রীতিভাব থাকে, ততদিন কর্ম্মযোগ অবলম্বনই কর্ত্তব্য।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতি ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥"

কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্কশকঠোর পথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বভাবতঃ যখন কর্ম্মে নির্বেদ বা বীতরাগ উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে সময়ে জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখবোধ হয়, সেই সময়

জীব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া শ্রীভগবানেরনামগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনে দৃঢ়বিশ্বাস হয়। ফলতঃ সেই হইতেই তাঁহার ভক্তিযোগে অধিকার জন্মে।

আবার কাহারও শ্রদ্ধা আকস্মিকভাবে উদিত হয়। অতএব শ্রদ্ধা উদয়ের কোন একটী নিশ্চিত বিধি নাই। উহা ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়েই স্ফুরিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ শ্রদ্ধালুব্যক্তিই অনন্যকৃষ্ণভক্তিলাভের অধিকারী। উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ত্রিবিধ। উত্তম অধিকারীর লক্ষণ —

"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥"

যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ এবং তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার ও পুরুষার্থবিচারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য—এ বিষয়ে যিনি দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছেন, সেই প্রৌঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তিই কৃষ্ণভক্তিতে উত্তম অধিকারী। ফলতঃ যাহার বিশ্বাস শাস্ত্র ও যুক্তির দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনিই উত্তম অধিকারী।

মধ্যম অধিকারীর লক্ষণ।—

"যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।"

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥" চৈঃ চঃ।

বহির্ম্মুখ জীব এই মধ্যম অধিকারীর কৃপা-সঙ্গ হইতেই কৃষ্ণ-ভক্তির মূল স্বরূপা শ্রদ্ধালাভ করিয়া থাকে। কারণ—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" শ্রীভাঃ

মধ্যম ভক্তগণই শ্রীভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী, কনিষ্ঠাধিকারী ও বহির্ম্মুখজনগণের প্রতি কৃপা এবং ভক্তিদ্বেষী তার্কিকগণের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সাধুসঙ্গের সুখ-সৌভাগ্য কেবল মধ্যমভক্তগণের নিকটই প্রাপ্তব্য।

কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণ—

"যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।"

যাঁহার শ্রদ্ধা শিথিল অর্থাৎ বিরুদ্ধশাস্ত্রযুক্তি দ্বারা যাঁহার মত সহজেই বিচলিত হয়, তিনিই কনিষ্ঠ অধিকারী। ইনি কেবল কৃষ্ণভক্তিকেই উত্তম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ক্রমে সাধুকৃপাসঙ্গ-গুণে ইঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূতা হইলে মধ্যম, পরে উত্তম অধিকারী হইয়া থাকেন।

ভক্তিধর্ম্মের অধিকার-বিচারে কোন বর্ণ-বৈশিষ্ট্য নাই। মানব-মাত্রেই ভক্তিতত্ত্বে ও ভক্তিধর্ম্মে অধিকারী। যথা, পদ্মপুরাণে—

"সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ।"

মাঘস্নানে যেমন সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতেও তেমন সকলেরই অধিকার আছে। অতএব –

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥" চৈ চঃ।

কোমলশ্রদ্ধ সাধকগণের পক্ষে শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত ক্রমোন্নতি কদাচ সম্ভব হয় না। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ ও

অর্চ্চনাদি সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবানের নিকট সকলই সমান, ভগবদ্ভক্তের নিকটও সেইরূপ সকলই সমান।

"নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যারূপ কুল-ধন ক্রিয়াদিভেদঃ।"

অর্থাৎ ভক্তগণের মধ্যেও জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়াদির ভেদবিচার নাই। সুতরাং গৃহী সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী নির্দ্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, সুস্থ আতুরাদি নির্ব্বিশেষে সকলই ভক্তি-সাধনার অধিকারী।

অনেকে বলেন, এই শোক-তাপ-মোহ-মৃত্যু-সমাকুল সংসারে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন হয় না। একথা সঙ্গত নহে। সংসারও ত ভগবানেরই অভিপ্রেত !! সংসার ভগবানের জৈবী লীলার রঙ্গালয়। সুতরাং ভগবানের চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সাংসারিক কার্য্য করিলে আর কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইতে হয় না পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এই সংসারকে সেই ভগবৎসংসারের ছায়াভাসরূপে পরিজ্ঞাত হইলে, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শান্তিসুখের উৎস উৎসারিত হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত যতটা বিষয়-স্বীকার করিতে হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য, ইন্দ্রিয়-প্রীতির উদ্দেশে করিলেই তাহা বন্ধের কারণ হয়। গৃহে অবস্থান করিয়াও যদি দেহে, গেহে, শয়নে, ভোজনে, গমনে সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অন্তরে কৃষ্ণানুশীলন ও বাহিরে যথোপযুক্তভাবে বিষয়-স্বীকার করা যায়, তাহা-হইলে এই সংসারে থাকিয়াই ভজনের চরম ফল প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিপুল বিষয় বিভবের কঠিন অঙ্কে থাকিয়াও কৃষ্ণভক্তির পরাবধিলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাসগোস্বামীর প্রতি যে মধুর শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

সাধু-সঙ্গ।

সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সৌভাগ্যবশতঃ জীবের হৃদয়াকাশে একবার শ্রদ্ধা-কৌমুদী সমুদিত হইলে প্রাণে এমন এক উদ্দাম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইবার নিমিত্ত এমন এক অদম্য আবেগ জন্মে যে, জীব অমলচিত্ত সাধু-গণের পদাশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। সেজন্য সর্ব্বদাই তিনি সাধুসঙ্গের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। সাধুসঙ্গই এই ভীষণ সংসার-কারাগার হইতে মোক্ষের দ্বার স্বরূপ। যদিও সাধনাভিনিবেশ হইতে প্রেম লাভ হয়, তথাপি মহৎ-কৃপা হইতেই প্রধানতঃ প্রেমলাভ হইয়া থাকে। তাই, নারদ সূত্র বলেন—

"মুখ্যতস্তু মহৎ কৃপয়ৈব।"

প্রেমলাভের দুইটী উপায়। একটী সাধনে অভিনিবেশ, দ্বিতীয় মহতের কৃপা। সাধনাভিনিবেশ অপেক্ষা মহৎ কৃপাহইতে অপেক্ষা-কৃত সহজে ও সুলভে প্রেম লাভ হইয়া থাকে। আবার ভগবানের কৃপালেশ হইতেও প্রেম বা ভক্তি উদিত হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রকট অবতারকালেই উহা সম্ভব, অন্য সময়ে নহে। অন্য সময় ভক্তদ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীভগবানের কৃপা ভক্তকৃপারই অনুগামিনী। ভক্ত যাঁহাকে কৃপা করেন শ্রীভগবানের কৃপাধারাও তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে—

"তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।"

শ্রীভগবানে ও তদ্ভক্তে ভেদ না থাকাতেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই ভক্তের ইচ্ছাবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীভগবান যাঁহার প্রতি কৃপা করিতে অভিলাষ করেন, তিনি সেই ভগবদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কোন সাধু পুরুষের ভাবনা-পদবীতে আবির্ভূত হইয়াও সেই সাধু-পুরুষের দৃষ্টি কৃপার্হ ব্যক্তির প্রতি সঞ্চালিত করেন। ইহাতেও জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের কৃপাই সাধুসঙ্গ লাভের কারণ। আবার এই ভাগবতী-কৃপারও একটী উপযুক্ত সময় আছে। জীবের হৃদয়ে আত্মশ্লাঘার পরিবর্ত্তে যখন আত্মগ্লানি বা অনুতাপের তীব্র-তুষানল জ্বলিতে থাকে, সেই সময় হইতেই শ্রীভগবানের কৃপা সঞ্চার হয়। পরে ঐ অনুতাপ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা-সহকারে দৈন্যে পরিণত হইলেই উক্ত কৃপা সাধু-সঙ্গরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সাধু-সঙ্গ আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, সাধুগণের নিজের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহাদের সঙ্গলাভের উপায়ান্তর নাই। তাঁহাদের এই ইচ্ছার কারণ সাধারণ মানববুদ্ধির অতীত। অজাতশ্রদ্ধ বহির্ম্মুখ জনগণের দৈবক্রমে সাধুসঙ্গলাভ হইলেও অবধানের অভাবে তাহাতে অপ্রবৃত্তি হেতু বা কালাদি বৈগুণ্যবশতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর লক্ষিত হয় না; কিন্তু বীজাকারে তাঁহাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে নিহিত থাকে। সময় হইলেই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সাধুসঙ্গের ফল কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।

সাধুসঙ্গ হইতেই সাধু কৃপালাভ হয়। সাধুকৃপা ও ভগবৎ-কৃপার মধ্যে সাধুকৃপাই মুখ্য। ভগবৎকৃপা কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রাথমিক কারণ হইলেও উহা গৌণ। দুরন্ত সংসার-সন্তপ্ত জীবের প্রতি তদীয় কৃপাধারা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, কৃপা চিত্তেরই বিকার-বিশেষ। ইহা পরদুঃখের স্পর্শ হইতে হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। ভগবান্ যখন নিত্য পরমানন্দ-রসময় ও নিত্যবিমল-স্বরূপ বলিয়া জীব হইতে নিত্য-বিলক্ষণ এবং নিখিল তমোতাপহারী স্নিগ্ধ-জ্যোতির আধার, তখন তাঁহার হৃদয়ে তমোময় দুঃখের স্পর্শ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং শ্রীভগবানের হৃদয়ে কৃপার স্ফুরণ অসম্ভব। অতএব সাধুকৃপাই কৃষ্ণভক্তি জন্মের মূল। যদিও সাধুগণ সংসার-দুঃখ-স্পর্শশূন্য তথাপি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নকল্পিত দুঃখ স্মরণ করে, তদ্রূপ সেই সাধুগণও কখন কখন সংসার সন্তাপ স্মরণ করিয়া সংসারের দগ্ধ প্রাণ আকুলকণ্ঠ জীবের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে যে ভগবৎকৃপার কথা উক্ত হইয়াছে—উহা দৈন্যাত্মিকা অর্থাৎ "তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়" ইত্যাদি দৈন্যবোধিকা ভক্তিসম্বন্ধ দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গজেন্দ্রের প্রতি এইরূপেই ভগবানের কৃপাধারা বর্ষিত হইয়াছিল।

দৈন্য-সহযোগেই এই কৃপা-প্রবাহ প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়। অতএব শ্রীভগবানের যে কৃপা সাধুগণের হৃদয়ে বিরাজ করে তাহা সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা রূপ বাহনের সাহায্যে জীবান্তরে সংক্রমিত হয় - স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে না। ভগবান্ স্বেচ্ছাময় হইলেও ভক্তাধীন। এজন্য সাধুসঙ্গের হেতু সাধুগণের স্বেচ্ছা-ধীনতার উপরও নির্ভর করে। সাধুকৃপার নিমিত্ত জীবের অন্য কোনবিধ উপাসনার অপেক্ষা করে না। যথা—

"ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ শ্রীভাঃ

যাঁহারা দেবতাগণকে যে ভাবে ভজনা করেন দেবতাগণ তাঁহাদিগকে সেই ভাবে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং দেবতাগণ ছায়ার ন্যায় কর্ম্ম-সচিব। কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল। কর্ম্মকাণ্ডহীন ভজনবিমুখ দীনজনের প্রতিই তাঁহাদের অপার করুণা।

জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভাবক জ্ঞানী সাধকের সঙ্গ এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎ-প্রেমিক সাধুর সঙ্গই কল্যাণপ্রদ। যে পরিমাণে যে ভাবে সাধুসঙ্গ লাভ হয় সেই অনুপাতেই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গের অপার মহিমা অচিন্ত্য প্রভাব। ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"ক্ষণার্দ্ধেণাপি তুলয়ে ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্তনাং কিমুতাশীষঃ ॥"

সাধু-সঙ্গের ক্ষণার্দ্ধের সহিতও স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না। সুতরাং ইহা অপেক্ষা জীবের শুভদায়ক আর কি আছে? ভক্তের কৃপাশীর্ব্বাদের প্রভাব যে কিরূপ অতুলনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

বলাই বাহুল্য, ভগবদ্ভক্তগণই সাধুপদবাচ্য। অধিকার বিশেষে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ও মিশ্রভেদে সেই সাধুগণের চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মধ্যম সাধুগণ হইতেই জীবের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সাধুসঙ্গ জনিত সৌভাগ্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। উত্তম ভক্তের লক্ষণ -

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাব মাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

ভগবানের নামাদি কীর্ত্তন দ্বারা চিত্তদ্রব অর্থাৎ হাস্য রোদনাদি-ব্যঞ্জক প্রেমভাব উপস্থিত হইলে যিনি অনুরাগের বশে চেতনাচেতন সর্ব্বভূতে নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন এবং যিনি স্বীয় হৃদয়-মন্দিরে স্ফূর্ত্তিশীল শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানে তদীয় আশ্রিত স্বরূপে সর্ব্বভূতকে অবলোকন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। ফলতঃ যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও ভেদজ্ঞানবিহীন তিনিই উত্তম ভক্ত। শাস্ত্রে—উত্তম ভক্তের আর একটী লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরি
রবশাভিহিতোপ্যঘৌঘ নাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ॥"

যাঁহার নাম অবশে উচ্চারণ করিলেও পাপান্ধকার বিনষ্ট হয় সেই হরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করিয়া যান না এবং যিনি স্বীয় হৃদয়স্তম্ভে সেই হরির চরণ-কমল প্রেমরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখেন তিনিই প্রধান ভক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ মধ্যম-অধিকারী বর্ণন স্থলে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ কথিত হইতেছে—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্ত প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, কিন্তু

তদীয় ভক্ত বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনিই প্রাকৃতভক্ত অর্থাৎ কনিষ্ঠ। ইনিও ক্রমে ভক্তির উত্তমাধিকারী হইবেন। যিনি অজাতপ্রেম শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক তাঁহাকেই মুখ্য কনিষ্ঠ বলা হয়।

পাদ্মোত্তর খণ্ডে অর্চ্চনমার্গে অর্থাৎ বৈধীভক্তিবিধানে উত্তম-ভক্তের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে তাহা এস্থলে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যথা —

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারো নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি পঞ্চসংস্কারযুক্ত, নবেজ্যা কর্ম্মকারক ও অর্থপঞ্চক-বেত্তা তিনিই মহাভাগবত পদবাচ্য।

(১) পঞ্চসংস্কার ; যথা —

"তাপঃপুণ্ড্রং তথানাম মন্ত্রোযাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

তাপ (উপবাসাদি) পুণ্ড্র (ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলকাদি ধারণ) নাম (কৃষ্ণদাসাদি নামকরণ) মন্ত্র (হরিনামাদি) ও যাগ (হোমাদি) — এই পঞ্চসংস্কারই ঐকান্তিকতার কারণ। এই পঞ্চসংস্কারযুক্ত সাধকই অর্চ্চনমার্গে মধ্যমভক্ত। এবং -

"শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥"

শঙ্খচক্রাদি ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণ ও ভগবানকে প্রণাম করাই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবত্বের লক্ষণ।

(২) নব ইজ্যা কর্ম্ম। যথা—

"অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধাভিদ্যতে শুভে॥"

অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ (ধ্যানাদি) যাগ (হোমাদি), বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা, শঙ্খচক্র ও তিলকাদি ধারণ এবং ভগবদ্ভক্তের আরাধন এই নববিধ কর্ম্ম নব ইজ্যা নামে অভিহিত।

(৩) অর্থপঞ্চক ; যথা—

উপাস্য, তৎপরমপদ, তদ্দ্রব্য, তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা ইহাই অর্থপঞ্চক। এ বিষয়ের বিচার শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

(ক) উপাস্য।—

"এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ॥"

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। সুতরাং তিনিই উপাস্য।

(খ) তৎপদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থান—

"স্থানতত্ত্বমতোবক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যমম্।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়-বর্জ্জিতম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থান প্রকৃতির পারে অবস্থিত। তাহা অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময়, কোটিসূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় প্রভান্বিত, চিন্তামণিময় এবং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, মহাপ্রলয়েও উহার ধ্বংস হয় না, সুতরাং

উহা সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্থান। শ্রীচরিতামৃতে এই ধামতত্ত্ব আরও পরিস্ফুটভাবে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎ-স্বরূপ—তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥"

অতএব প্রকৃতির পার সিদ্ধলোক, এই সিদ্ধলোক অতিক্রম করিয়াই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম, তদুপরি অর্থাৎ—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥"

(গ) তদ্দ্রব্য।—অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি।—

"সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্প-পাদপাঃ।
ভবন্তি তাদৃশা বল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশম্॥"

অর্থাৎ সেই ভগবদ্ধামে সকল দ্রব্যই সর্ব্বভোগপ্রদ, তথাকার তরুলতাদি কল্পতরুলতা। সুতরাং তাহাদের পত্র-পুষ্প-ফলাদিও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। তথায় কোন হেয় দ্রব্য বা দ্রব্যাংশ (ত্বগাদি) নাই, সকলই রসময় ও মঙ্গলদায়ক।

(ঘ) মন্ত্র। যথা—

"বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেব স্তন্মন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥"

দেবতাই বাচ্য এবং তদীয় মন্ত্রই বাচক। তত্ত্ববিদ্গণ বিচার করিয়া এইবাচ্য-বাচক বা দেবতা ও মন্ত্র অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ঙ) জীবাত্মা।—

"মরুৎ সাগর-সংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধি-সমাবৃতাঃ॥"

বায়ু-বিক্ষোভিত সাগরবক্ষে তরঙ্গাভিঘাত দ্বারা যেমন অসংখ্য জল-বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চিৎ-সমুদ্রের কণিকাস্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলেই জীব পদবাচ্য হয়।

এই প্রমাণে জীবকে উপাধিবিশিষ্ট বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু স্ব স্ব উপাসনা-শাস্ত্রের বিচারে এই জীবাত্মা সম্বন্ধে অপর বিশেষও কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও গীতায় জীবাত্মাকে শ্রীভগবানের অংশ বা তটস্থা শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় উহার নিরুপাধিত্ব স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে। যথা—

"বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।"

জীবই ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি নামে অভিহিত। আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা

অর্থাৎ জীবই আমার অংশ।

অনন্তর মিশ্র ভক্তি-সাধক লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা—

"কৃপালুরকৃতদ্রোহ স্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈ রহতধী দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্ত স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিত-ষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥"

যিনি কৃপালু (পরদুঃখ-অসহিষ্ণু), যিনি কোন দেহীরই অনিষ্টাচরণ করেন না, যিনি ক্ষমাবান্. সত্যসার, অসূয়া-রহিত, সুখদুঃখে সম, যথাশক্তি সকলের উপকারক, কাম দ্বারা যাঁহার চিত্তক্ষোভ হয় না, সংগত-বাক্যেন্দ্রিয়, কোমল-হৃদয়, অপরিগ্রহ, দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, মিতাহারী, শান্ত, স্বধর্ম্মানুরক্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, মননশীল, সাবধান, নির্ব্বিকার, ধৈর্য্যশীল, জিতষড়্গুণ অর্থাৎ যিনি শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হন না, যিনি অমানী, মানদ, পরবোধনে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক ও সম্যক্ জ্ঞানী।

"এই গুলি উত্তম মিশ্র-সাধকের লক্ষণ। এইরূপ মধ্যম মিশ্র-সাধকের লক্ষণও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥"

বেদরূপে আমি (শ্রীভগবান্) আদেশ করিলেও যে ব্যক্তি সেই স্বধর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করেন. তিনিই শ্রেষ্ঠভক্ত। অজ্ঞান বা নাস্তিক্য বশতঃ যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ হয়, তাহা নহে। ধর্ম্মাচরণের গুণ ও তাহার বিপরীত আচরণে দোষের বিষয় অবগত হইয়াও, আমার ভক্তি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হইবে. এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় সহকারেই তাঁহারা আমার আদিষ্ট নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্ম ও স্বীয় বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভক্তিতে চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তার কারণই তাঁহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভক্তি-তরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কর্ম্মিদের মধ্যে যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা বুদ্ধিতে সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা—

"ধর্ম্মার্থঃ জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়া স্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥"

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন ধারণ করেন, সন্তানোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রী-সঙ্গ করেন এবং প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবার জন্যই ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

আবার যাঁহারা কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া থাকেন তাঁহারা উক্ত কর্ম্মীভক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। শাস্ত্রে এইরূপ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র সাধুগণের বহুভেদ কথিত হইয়াছে। তাঁহারা শুদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি কোন একটী ভাবকে অনন্যভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম। তাঁহাদের কৃপা-সঙ্গ প্রভাবেই হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যেহেতু যিনি যেরূপ ভাবের অধিকারী ভক্ত, তাঁহার সঙ্গগুণে তদ্রূপ ভক্তির উন্মেষ হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ জ্ঞান-মার্গে জ্ঞানী-সঙ্গের তারতম্যে জ্ঞানেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে একবার সাধুসঙ্গলাভ ঘটিলে জীবের ভক্তি লাভ সম্বন্ধে কোন বাধা হয় না। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে ঘোষিত হইয়াছে।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।"

ভক্তি সাধু-সঙ্গ হইতেই উদিত হয়। আবার শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য-সম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

সাধুগণের সংসর্গে আমার মাহাত্ম্য ও প্রভাব সম্বন্ধে যে অনর্থনাশিনী ও শ্রবণমনের সুখদায়িনী কথা হইতে থাকে, সে কথামৃত আস্বাদন করিতে করিতে অপবর্গবর্ত্ম স্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে আশু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গ-প্রভাবে প্রথমতঃ তদীয় ভজনমার্গ-বিষয়ে রুচি বা আসক্তি জন্মে, সেই রুচিবশতঃ সাধুগণের মধ্যে এক বা একাধিক জনকে শ্রীগুরুরূপে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠাবশতঃই শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। কেহ বা আরম্ভ-উপসংহারাদি দ্বারা তাহার অর্থাবধারণ বিচার ও মনন করেন এবং সেই বিচার-বুদ্ধি হইতেই ক্রমে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। এই জন্যই প্রথমোক্তটী রুচি-প্রধানমার্গ এবং দ্বিতীয়টী বিচার প্রধানমার্গ নামে অভিহিত। রুচি প্রধানমার্গে কোন বিচারের অপেক্ষা না থাকিলেও সাধুসঙ্গ, লীলাকথা শ্রবণাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রেমভক্তিলাভেচ্ছু সাধকগণের পক্ষে এই রুচি-প্রধানমার্গ অবলম্বনীয়। যাঁহারা অজাতরুচি, তাঁহাদের পক্ষে বিচার-প্রধানমার্গই শ্রেয়ঃ। তাই, ভক্তবীর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"তত্তেহর্হত্তম নমঃ স্তুতি কর্ম্ম পূজাঃ
কর্ম্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্ ॥

সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥" শ্রীভাঃ

হে পূজ্যতম! নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ অর্চ্চন, শ্রীচরণ-স্মরণ, কথা শ্রবণ, এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতিরেকে পরমহংসদিগের প্রাপ্য যে আপনি,—আপনাতে লোক কি প্রকারে ভক্তিলাভ করিবে?

উভয়বিধ সাধন-মার্গেই শ্রীগুরুপদাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ-গুরুই উভয়মার্গে ভজন-বিধি শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা-গুরুরূপে বরিত হইয়া থাকেন। গুরুপদাশ্রয় চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গের প্রথম অঙ্গ। ইহার বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। এক্ষণে কিরূপ ভাবে জীবনকে পরিচালিত করিলে ভক্তির অনুশীলন বৃদ্ধিপায়—দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি ভক্তির কমনীয় ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠে, তৎসম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলা যাইতেছে।

শ্রীভগবান্ কলিহত দুর্গত জীবকে করুণার অমৃত ধারায় শান্ত স্নিগ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যাকুল, কিন্তু আঁমরা সে করুণা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি কই? তাঁহাকে প্রাণের আকুল আবেগে ডাকিতেছি কই? পাপ-তাপের তীব্র-তুষানলে হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি দিবানিশি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে—সে জ্বালার কথা—সে প্রাণের ব্যথা তাঁহার চরণ-প্রান্তে অনুতাপের তপ্ত-তরল ভাষায় অকপটে নিবেদন করিতেছি কই? যিনি ডাকেন—যিনি প্রাণের কথা নিবেদন করেন, তিনিই তাঁহার করুণালাভে ধন্য হন। বিপদে পড়িলেই লোকে ভগবান্‌কে ডাকে। সুতরাং কোন না কোন একটা বিপদের বিভীষিকা সম্মুখে রাখিতে পারিলেই সর্ব্বদা ভগবানের কথা মনে পড়ে। আর সেই সঙ্গে যদি আত্মচিন্তা করা

যায় অর্থাৎ "কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়।" এই সংসারে আমি কে? কয় দিনের জন্যই বা আসিয়াছি; সুতরাং কেবল বিষয়-বিষপানে জ্বলিয়া মরি কেন? কেনই বা পাপতাপ-আদি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর করাল-কবলে পুনঃপুন নিষ্পেষিত হইতেছি। এইরূপ আত্মচিন্তার ফলেও মন ভক্তিপথে অগ্রসর হয়। অথবা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে ভগবানের করুণার প্রতিফলন দর্শন করিলেও হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া, ভগবনের চরণে প্রণত হইয়া পড়ে। এই যে রবি-শশী জগতের অন্ধকার নাশ করিতেছেন, এই যে মৃদু সমীর দর বিকশিত কুসুম-কলাপের পরাগ মাখিয়া স্নিগ্ধ-পরশে জীবের তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছে। ওই যে কল-নাদিনী স্রোতঃস্বিনী মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গে সাগর সম্ভাষণে প্রধাবিত হইতেছে— ঐ যে শ্যামল তরুলতা পত্র পুষ্প-ফলভরে অবনতশীর হইয়া রহিয়াছে। সবই তো জীবের জন্য! ইহাও কি জীবের প্রতি শ্রীভগবানের নির্ব্বিকার অপার করুণার পরিচয় নহে? যতই এই করুণায় কথা চিন্তা করা যাইবে, ততই ভগবানের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা এমনই মোহান্ধ সংসারে বিষয় সুখে ইন্দ্রিয়-লালসে এতই বিমুগ্ধ যে, আমরা আত্মচিন্তার আদৌ অবসর পাই না। ইহাই আমাদের অধঃপাতের মুখ্য কারণ। ইন্দ্রিয়-সেবাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।—যথা গরুড় পুরাণে—

"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-
মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

কুরঙ্গ বংশীধ্বনি শুনিয়া কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যাধের বাগুরায় পতিত হয়। বন্যহস্তী গৃহ-পালিত হস্তীর অঙ্গ-সঙ্গ-লালসায় কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শ-সুখ-সম্ভোগের জন্য চির-দিনের মত বন্দী হয়, পতঙ্গ কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনার্থই অগ্নিশিখা মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারায়, ভ্রমর ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পদ্ম মধ্যে তন্ময়ভাবে অবস্থান করে, পরে সন্ধ্যাসমাগমে পদ্ম মুদ্রিত হইলে তন্মধ্যে থাকিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করে, এবং রসনেন্দ্রিয়ের লালসা চরিতার্থ করিতে গিয়া মৎস্য বড়শীবিদ্ধ হইয়া জীবন হারায়। অতএব এক একটী ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়াই জীবের যদি এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা হইলে যাহারা পূর্ণ মাত্রায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবা করে তাহা-দের দশা যে কিরূপ ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল তাহা সহজেই অনুমেয়।

অতএব ভোগসুখ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণে চিত্ত সমর্পণ করাই জীবের পক্ষে পরম কল্যাণকর। ভক্তির সাধন এমনই বিচিত্র যে সাধক জীবনে কোন কামনা থাকিলেও তাহার জন্য সাধকের ভক্তিলাভে কোন বাধা হয় না। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ এমনই করুণাময় তিনি অনন্ত মাধুর্য্য-মণ্ডিত স্বীয় শ্রীচরণ-পল্লবদানে ভক্তের সেই কামনা ভুলাইয়া দেন।

"কৃষ্ণ কহে আমা-ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

সাধু-সঙ্গ ভক্তিলাভের অমোঘ উপায় হইলেও সর্ব্বদা সুলভ

নহে। সুতরাং সাধ্যমত পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে সহজেই সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ সাধুগণের দ্বারাই তীর্থের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন। পরন্তু তীর্থসেবায় অসমর্থ হইলে বা সাধুগণের সর্ব্বদা দর্শনাভাব ঘটিলে দুই-চারি জন মিলিত হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ভক্তচরিত্র আলোচনা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে সাধুসঙ্গের সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং জীবন ক্রমশঃ ভক্তিপথেই অগ্রসর হইতে থাকে।

অষ্টম উল্লাস

—:*:—

সাধনাঙ্গ বিচার।

ভক্তির অনুশীলনই ভক্তির সাধন-অঙ্গ। শাস্ত্রে বহুবিধ সাধনাঙ্গ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৪ অঙ্গই প্রধান। আবার এই চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয়টী সাধনাঙ্গ মুখ্য, অপর সমস্ত অঙ্গ তাহার অনুষঙ্গ। এই সকল সাধনাঙ্গের অনুশীলনেই সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে ক্ষীণ ভক্তির প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট, প্রবল ও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় যে দশটী অঙ্গ কথিত হইয়াছে তাহা ভক্তির প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ। যথা—

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

"গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগশ্চ কৃষ্ণহেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর-সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি-গৌরবম্॥
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা॥"

১। শ্রীগুরুপদাশ্রয়।

শাস্ত্রে শ্রবণগুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু ভেদে গুরুর ত্রিবিধ বিভেদ কথিত হইয়াছে। সংসারে একটী সামান্য বিষয়ের শিক্ষালাভের জন্যও যখন উপদেষ্টা গুরুর প্রয়োজন হয়, তখন পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শ্রীগুরুপদাশ্রয় যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র ভব-কর্ণধার। উপাস্য-তত্ত্ব হইতেও গুরুর মহিমা অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা - গৌতমীয়ে—

"গুরু প্রদর্শিতো দেবো মন্ত্র-পূজাবিধির্জপঃ।
ন দেবেন গুরুর্দৃষ্টস্তস্মাৎ দেবাৎ পরং গুরুঃ॥"

গুরুদেবই কৃপা করিয়া সাধকের উপাস্য দেবতাকে এবং তদীয় মন্ত্র, পূজাবিধি ও জপের প্রণালী দেখাইয়া দেন, কিন্তু কোন দেবতা গুরুদেবকে দেখাইয়া দেন না। এইজন্যই গুরু দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই কারণেই সর্ব্বাগ্রে গুরু-পূজা করিয়া পরে ইষ্ট-

দেবতার পূজা করিতে হয়। "গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ"—গুরু কৃপা না হইলে কৃষ্ণ-কৃপা হয় না। এই জন্যই সাধন-ভক্তির প্রথম সোপান গুরুপদাশ্রয়। প্রথমতঃ শ্রবণগুরু হইতেই ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রবণ-গুরুর লক্ষণ, যথা—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

অতএব যিনি পরাভক্তি লাভের অভিলাষ করেন, তিনি বেদাখ্য শব্দব্রহ্মের ব্যাখ্যায় পারদর্শী এবং পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-যোগ-পরায়ণ গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবেন। শ্রবণগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরু প্রায়শঃ একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন। কারণ, যাঁহার বদন-নিঃসৃত হরিকথামৃত পানে প্রাণ-মন শ্রদ্ধার আবেশে সুস্নিগ্ধ হয়, তাঁহারই শ্রীচরণোপান্তে বসিয়া হরি-ভজন প্রণালী জানিবার ও শিখিবার সাধ স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। এই কারণে সাধক শ্রবণগুরুকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রবণগুরুতে ও শিক্ষাগুরুতে একত্ব দর্শন করেন। যথা— শ্রীভাগবতে—

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্ম দৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

অর্থাৎ গুরুই জীবন, গুরুই ইষ্ট-দেবতা,—এই রূপ দৃঢ় নিশ্চয় পূর্ব্বক অভিমানশূন্য হইয়া ও তদীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া সেই শ্রবণগুরুর সমীপেই ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। যে হেতু, সেই ভক্তি-ধর্ম্ম দ্বারাই পরমাত্মা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান হয় এবং তিনি শ্রীবলিরাজ প্রভৃতির ন্যায় ভক্তকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

গুরু-পদাশ্রয়ের পূর্ণ-সৌভাগ্যের অভাব হইলে একাধিক গুরুর পদাশ্রয়ও প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণে শাস্ত্রে মন্ত্রদীক্ষা গুরুর একত্ব এবং সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবশ্যক হইলে, শিক্ষাগুরুর বহুত্ব সূচিত হইয়াছে। যথা—

"ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্পলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥"

যিনি দীক্ষাগুরু হইবেন, তাঁহার শিক্ষা দিবার সামর্থ্য বা অধিকার নাই, এরূপ আশঙ্কাও অপরাধজনক। মন্ত্রদীক্ষাগুরু একই ব্যক্তি হইবেন। যথা—

"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥"

শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণোপান্তে মন্ত্র-বিধিশাস্ত্র শিক্ষা করিবেন এবং স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। এস্থলে আচার্য্য শব্দের একবচনে গুরুদেবের একত্ব বোধিত হইয়াছে। অতএব আগম-মন্ত্র-শাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকটই মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। "গুরুর্যেন পরিত্যক্ত স্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরি।" ইত্যাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইলেও অবৈষ্ণব গুরুত্যাগে কোন দোষ হয় না। যথা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেণ মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥"

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র সংসারোদ্ধারের কারণ না হইয়া বরং নরকেরই কারণ হইয়া থাকে। অতএব পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট যথাবিধি মন্ত্রগ্রহণ করা বিধেয়। এইজন্যই দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া ভজন-পরায়ণ কোন গুরুযোগ্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করা শ্রেয়ঃ। দীক্ষা-গ্রহণের পর দীক্ষা-গুরুসম্বন্ধে মূর্খ-বিদ্বান্ বিচার বা গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিলে নিরয়-গামী হইতে হয়। শ্রবণ-গুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রুতি বলেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।"

গুরুর ন্যায় এমন পরম কল্যাণময় অপার স্নেহ-জলধি আর কেহই নাই। শ্রীগুরুর অভয়-চরণ-পদ্মে চিত্ত-ভৃঙ্গ একবার গাঢ় নিবিষ্ট হইলে আর জীবের কোন অভাবই থাকে না,—জীবের অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয়-মন্দির দিব্যজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং জীব পরাগতির কুসুমাস্তীর্ণ মঙ্গলময় পথ অনায়াসে দেখিতে পায়।

বিষয়-খিন্ন তাপজীর্ণ জীবের শিক্ষাগুরুর যে একান্ত আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মন-তুরঙ্গ বিষয়-কণ্টকাকীর্ণ পথে সর্ব্বদাই উন্মার্গগামী, সততই ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অধীন; সুতরাং তাদৃশ অশান্ত মনকে সংযত করিয়া ভগবদন্তর্মুখী করিতে যে একজন উপায়বিদ্ বিচক্ষণ ব্যক্তির সহায়তা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে এই ছিদ্রময় জরাজীর্ণ দেহ-তরী লইয়া পার হইতে হইলেই উপযুক্ত কর্ণধারের প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবই স্বয়ং কর্ণধার। যাঁহার ভাগ্যে এই গুরুকৃপালাভ হইয়াছে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অনুকূল পবনরূপে তাঁহার পারের সহায়তা করেন।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ব্যসন-ব্যাকুল জীবের মন শ্রীভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে শীঘ্র নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে—

"গুরোর্ভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥"

গুরুভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। কিন্তু এইরূপে তিনি সুলভ্য হইলেও অহঙ্কারপূর্ণ জীব কদাচ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। তাই শ্রুতিও ঘোষণা করিয়াছেন —

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁহার ইষ্টদেবে ও গুরুদেবে তুল্য ভক্তি হয়, সেই মহাত্মারই তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়।

এইরূপেই মন্ত্রদীক্ষা গুরুরও আবশ্যকতা বোধিত হইয়াছে। জীবের পরমার্থ-পথে বিঘ্ন-দায়ক হইলে পিতা-মাতা প্রভৃতি ব্যবহারিক গুরু ত্যাগেও কোন দোষ হয় না। যথা —

"গুরু র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স
স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ
স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥"

যিনি সংসারাসক্ত জীবের নিদারুণ সংসার-বন্ধন মোচন করিতে পারেন না, সেই গুরুও গুরু নহেন, স্বজনও স্বজন নহেন, পিতাও পিতা নহেন, মাতাও মাতা নহেন, দেবতাও দেবতা নহেন, পতিও পতি নহেন।

গুরু-শিষ্যের সহিত কেবল বার্ষিক আদান-প্রদান সম্বন্ধ নহে,

জীবনে-মরণে অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এই জন্যই বংশ-পরম্পরাক্রমে গুরুবংশের নিকট মন্ত্রগ্রহণ অধিকতর কল্যাণপ্রদ। তবে, শিষ্যের আত্মোন্নতি-বিধানের নিমিত্ত গুরুদেব শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, এরূপ সাধন-শক্তি-সম্পন্ন কিনা তাহা অবশ্য দেখা কর্ত্তব্য। আবার গুরুদেবের দ্বারা কোন কুশক্তি, শিষ্যে সংক্রামিত না হইতে পারে, সে বিষয়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্র মন্ত্রশক্তি সঞ্চারের উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে কি না, গুরুদেব মন্ত্র-বীজাদি প্রদানের পূর্ব্বে বা দীক্ষাদানের পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। নতুবা অপাত্রে দীক্ষা, ফল-প্রসবিনী হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের লক্ষণ, শিষ্যের পরীক্ষা প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি গ্রন্থের আলোচনা করিবেন। আমরা স্থানাভাবে এ তত্ত্বের সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছি।

সদ্‌গুরুর লক্ষণ, যথা মন্ত্রমুক্তাবলীতে —

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচার-তৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশ স্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তাবিমর্ষকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্ গরিমাম্বুধিঃ॥"

যিনি সদ্বংশজাত, স্বয়ং বিশুদ্ধ, পবিত্রাচারপরায়ণ, আশ্রমী, অক্রোধ, দেববিৎ, দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধান্বিত, অসূয়াশূন্য, প্রিয়ভাষী, প্রিয়দর্শন, শুচি, শুদ্ধবেশধারী, তরুণ, সর্ব্ব প্রাণীর হিতকারী, বুদ্ধিমান্, অনুদ্ধতচিত্ত, সর্ব্বকার্য্য-কুশল, তত্ত্ব-বিচার-ক্ষম, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, ভগবৎ-পূজাদি-তৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্য-বৎসল, শিষ্যের দোষগুণ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সক্ষম, হোম ও মন্ত্রাদি-বিধানজ্ঞ, তত্ত্ব বিষয়ে তর্ক বিতর্ক পারদর্শী পবিত্রাত্মা ও কৃপার আধার, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গৌরব-সমুদ্র ব্যক্তিই গুরু যোগ্য। শিষ্যের লক্ষণ ঃ—

"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধী দম্ভ-বর্জ্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভি র্দিবানিশং॥
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি-লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥"

সদ্বংশজাত, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন সত্যবাদী, পবিত্র-স্বভাব, সদ্‌বুদ্ধিশালী, দম্ভরহিত, কামক্রোধপরিত্যাগী, গুরুপদে একান্ত ভক্তিমান্, কায়মনোবাক্যে দিবানিশি দেবতা-পরায়ণ, নিরোগী, পাপাচার-বিমুখ, শ্রদ্ধালু, দেব, দ্বিজ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনারত, যুবক, সংযতেন্দ্রিয় ও করুণাময় ইত্যাদি-লক্ষণ-যুক্ত শিষ্যই দীক্ষার অধিকারী।

গুরু ও শিষ্য একবৎসর একত্র অবস্থান করিয়া পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষা করিবেন। এইরূপে শিষ্যকে একবৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্রপ্রদান করা কর্ত্তব্য। যে হেতু, পাপিষ্ঠ শিষ্যকে বা মন্ত্রগ্রহণের অযোগ্য শিষ্যকে মন্ত্রপ্রদান করিলে, অমাত্যের পাপ যেমন রাজাতে বর্ত্তে, পত্নীর পাপ যেমন পতিতে বর্ত্তে, সেইরূপ সেই শিষ্যের পাতকও গুরুতে বর্ত্তিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অগ্রে পরীক্ষা করিয়া শিষ্য সৎস্বভাবসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলে দীক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে স্থলে এরূপ গুরু-শিষ্যের পরীক্ষার অন্তরায় আছে,—সেস্থলে দেখিতে হইবে, গুরুর শক্তি-সঞ্চালন শক্তি জন্মিয়াছে কি না? এবং শিষ্যের মন্ত্রগ্রহণের ভক্তিপূর্ণ আগ্রহ আছে কি না? কুলগুরু ও বংশপরম্পরাগত শিষ্য সম্বন্ধে প্রায়ই এরূপ পরীক্ষা-কঠোরতার প্রয়োজন হয় না।

পিতৃদত্ত মন্ত্র বীর্য্যহীন হইলেও তাঁহার নিকট সিদ্ধ বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণে কোন দোষ হয় না। মাতৃদত্ত সকল মন্ত্রই সমধিক বীর্য্য-শালী। বিশেষতঃ মাতা যদি বাৎসল্যপ্রযুক্ত পুত্রকে নিজমন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে গুরুবিচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য। তবে গুরুপত্নী প্রভৃতি অন্য স্ত্রী-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাতে গুরুর গুণ আছে কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'সৌভাগ্যক্রমে স্বপ্নে মন্ত্রলাভ হইলেও গুরু-করণের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু কোনরূপ বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা নাই।' তন্ত্রসারে উক্ত হইয়াছে—

"স্বপ্নলব্ধমন্ত্রো যদি সদগুরুং প্রাপ্নোতি, তদা তত এব তন্মন্ত্রং গৃহ্লীয়াৎ, নো চেৎ জলপূর্ণ-কলসে গুরোঃ প্রাণ

প্রতিষ্ঠাং বিধায় বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিতং মন্ত্রং তৎ কলসে প্রক্ষিপ্য উত্তোল্য মন্ত্রং গৃহ্লীয়াদিতি ॥"

অর্থাৎ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ হইলে, যদি সদ্গুরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে ঐ মন্ত্র পুনগ্রহণ করিবেন। গুরুর একান্ত অভাব হইলে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া উক্ত কলসে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে সেই বটপত্র উত্তোলন পূর্ব্বক স্বয়ং মন্ত্র-গ্রহণ করিবেন।

সংক্ষেপ দীক্ষা-বিধি।

মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধ্যাদি বিচাব পূর্ব্বক অধিকারী ভেদে মন্ত্র প্রদান গুরুর অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ মন্ত্র-বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে বা শ্রীগোপাল মন্ত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। যথা—

"শ্রীমদ্ গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্ শক্তিষু মন্ত্রেষু ন হি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥"

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশক শ্রীগোপালদেবের মন্ত্র সকলও তাদৃশ শক্তি সম্পন্ন। এইজন্য গোপালমন্ত্রে কিছু বিচার করিতে হয় না।

আবার বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

"নাত্র চিন্ত্যোঽহরিমিত্রাদিনাঽরিমিত্রাদিলক্ষণং।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রমঃ ॥
অজ্ঞান-তুলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ।
সিদ্ধ-সাধ্য সুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা ॥
সর্ব্বেষাং সিদ্ধমন্ত্রাণাং যতো ব্রহ্মাক্ষরো মনঃ ॥"

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে অরি-মিত্রাদির বিচার করিতে হয় না। ইহার সাধনে প্রয়াস-বাহুল্য কি অতিরিক্ত পরিশ্রমেরও আবশ্যক করে না। সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতি যে সকল বিচার অন্য মন্ত্রে আবশ্যক, তাহা ইহাতে কিছুই প্রয়োজন হয় না। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তুলারাশিকে অনায়াসে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রও অজ্ঞানরাশিকে ক্ষণমাত্র ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। ইহা সকল সিদ্ধমন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সাক্ষাৎ ব্রহ্মাক্ষর।

অন্যান্য মন্ত্র সংস্কার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে তাহারও আবশ্যকতা নাই। যথা—

"বলিষ্ঠাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি।
সামান্যোদ্দেশমাত্রেন তথাপ্যেতদুদীরিতং ॥"

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র স্বাভাবিক বলবান্। সুতরাং মন্ত্রের জনন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ দীপন ও গোপন এই যে দশটী সংস্কার আছে, তাহা এই মন্ত্রে আবশ্যক হয় না। তবে, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রে আবশ্যক হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণানুচর গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণোপাসক —ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের যখন সংস্কার-অপেক্ষা নাই, তখন উক্ত দশবিধ সংস্কারের বিবরণ উদ্ধৃত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়। এজন্য উক্ত দশবিধ সংস্কার এস্থলে লিখিত হইল না। এক্ষণে কিরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

শাক্ত, শাক্ত-গুরুর নিকট, শৈব, শৈব-গুরুর নিকট এবং বৈষ্ণব বৈষ্ণব-গুরুর নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। নতুবা মন্ত্রশক্তির বিকাশ হয় না। আবার সম্প্রদায়-সিদ্ধ বৈষ্ণবের নিকটই মন্ত্র-গ্রহণ কর্ত্তব্য; নতুবা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্র নিষ্ফল হইয়া থাকে। যথা—

"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে বিফলাঃ মতাঃ।"

শিষ্য দীক্ষার পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া কিম্বা হবিষ্য বা নিরামিষ ভোজন করিয়া দীক্ষা দিবসে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ এইরূপ প্রার্থনা করিবেন—

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার-বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥"

হে জগতের উদ্ধারকর্ত্তা গুরো! আমি সংসার-দাবানলে সর্ব্বদা সন্তপ্ত ও কাল-সর্পদষ্ট, আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণাগত হইলাম।

অনন্তর তিলক ও তুলসীমালা ধারণ পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া (বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক) বলিবেন—"এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ,— এতে গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ—এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ,—এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি-দশদিকপালেভ্যো নমঃ,—এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—এতে গন্ধপুষ্পে বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ"।

এইরূপ মন্ত্রে গুরুদেব স্থাপিত ঘটে বা শ্রীশালগ্রামে বা গুরুদেব অঙ্কিত যন্ত্রে—চন্দন-তুলসী পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। পরে আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বা লইয়া গুরুদেবের দক্ষিণ জানু

ধরিয়া পাঠ করিবেন—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দীক্ষা কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" গুরুদেব বলিবেন—"পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।" শিষ্য —"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দীক্ষাকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।" গুরু— ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।" শিষ্য—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দীক্ষাকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" গুরু—ওঁ ঋদ্ধিং ওঁ ঋদ্ধিং ওঁ ঋদ্ধিং।"

পরে তাম্রাদি পাত্রে কুশ বা দূর্ব্বা, তিল, হরিতকী ও জল লইয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন—"শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা বা দাসঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ বা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিপ্রাপ্তি-কামঃ অমুক মন্ত্রস্য দীক্ষামহং করিষ্যে।" পরে গুরুবরণ করিবেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন—"সাধু ভবনাস্তাম্।" গুরু—ওঁ সাধ্বহমাসে।" পরে বস্ত্র, অঙ্গুরি, যজ্ঞোপবীত লইয়া শিষ্য বলিবেন—"অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" গুরু—ওঁ অর্চ্চয়। অনন্তর গুরুদেবের পূজা করিবেন।—"এতৎপাদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ।" এইরূপ—এবোঽর্ঘ্যঃ। ইদমাচমনীয়ং। এষ মধুপর্কঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং। ইদং স্নানীয়ং। ইদং সোত্তরীয় বস্ত্রং। ইদং আভরণং। এষ গন্ধঃ। ইদং পুষ্পং। ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং। এষ ধূপঃ। এষ দীপঃ। ইদং নৈবেদ্যং। ইদং পানীয়ং। ইদমাচমনীয়ং। এতত্তাম্বূলং। ইদং পুনরাচমনীয়ং। ইদং যজ্ঞোপবীতং। ইদং মাল্যং। এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীগুরবে (বা ঐঁ গুরবে) নমঃ।" ইত্যাদিরূপে গুরুপূজা করিয়া গুরুর দক্ষিণ-জানু ধরিয়া এই মন্ত্রপাঠ করিবেন—"শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক মন্ত্রস্য দীক্ষা-গ্রহণ কর্ম্মণি গুরুকর্ম্ম-করণায় অমুক গোত্রং বিষ্ণুপাদ-অমুক

দেবশর্ম্মাণং বা বৈষ্ণবাধিকারিণং এভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।” গুরু—“ওঁ বৃতোঽস্মি।” শিষ্য করপুটে —“যথা-বিহিত গুরুকর্ম্ম কুরু।” গুরু —“ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।”

অতঃপর গুরুদেব, যে মন্ত্র শিষ্যকে দেওয়া হইবে সেই মন্ত্র-দেবতার যথাবিধানে ষোড়শ বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। এই পূজা-পদ্ধতি পরে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। পূজার পর সেই মন্ত্রের অন্তে “স্বাহা” শব্দ যোগ করিয়া কেহ কেহ তান্ত্রিক-বিধানে ১০৮ বার হোম করিয়া থাকেন। সামান্য দীক্ষায় যেখানে পঞ্চোপচারে পূজা হয়, সেস্থলে দীক্ষাঙ্গ-হোমের প্রয়োজন হয় না। হোমের প্রয়োজন হইলে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

অনন্তর শিষ্যকে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত কোশা বা শঙ্খের জলে ১০৮ বার প্রদেয় মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল শিষ্যের মস্তকে প্রদান করিবেন এবং—“অমুক দেবস্য মন্ত্রং তে দদামি।” বলিয়া শিষ্যের হস্তেও একটু দিবেন। শিষ্য—“দদস্ব” বলিয়া সেই জল গ্রহণ করিবেন। পরে গুরুদেব পূর্ব্ব-মুখে বসিয়া প্রদেয় মন্ত্রটী প্রণব-সংযুক্ত করিয়া শিষ্যের মস্তকে ৭ বার জপ করিবেন এবং শিষ্যের দেহে ঐ মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন। শিষ্য মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়া বসিয়া গুরুর দুই পদধারণ করিবেন। তখন গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে (স্ত্রী ও শূদ্রের বামকর্ণে) ঋষ্যাদিযুক্ত বীজমন্ত্র ৮ বার স্পষ্ট করিয়া শুনাইবেন। পরে গুরুদেব স্বীয় শক্তি-সংরক্ষণের নিমিত্ত সেই মন্ত্র স্বয়ং ১০৮ বার জপ করিবেন।

গুরু, শিষ্যকে সেই মন্ত্রের অর্থ, ভাব ও মন্ত্র-দেবতার মূর্ত্তি

বলিয়া দিবেন। শিষ্য মন্ত্রানুগত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্রজপ করিবেন। পরে—

"গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মাৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ ত্বয়ি-স্থিতিঃ॥"

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈঃ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তখন গুরুদেব শিষ্যের হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া বলিবেন—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।
কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥"

পরে শিষ্য যথাসাধ্য দক্ষিণান্ত করিবেন। যথা—

"শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ কৃতৈতৎ অমুক দেবস্য অমুক মন্ত্রস্য দীক্ষাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ স্বুবর্ণমূল্যং রজতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ দৈবতং অমুক গোত্রায় বিষ্ণুপাদ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে বা বৈষ্ণবাধিকারিণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" দক্ষিণা দিয়া বলিবেন—"কৃতৈতৎ দীক্ষাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ দীক্ষাকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ বা স্মরণ মহং করিষ্যে। শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ। ইতি।

দীক্ষা শব্দের অর্থ 'তত্ত্বজ্ঞান'।—"দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়ন্তে পাপ-পদ্ধতিঃ তেন দীক্ষোচ্যতে।" যাহা হইতে পরম জ্ঞান লাভ

হয় ও পাপ-পদ্ধতি ক্ষীণ হয়, তাহার নাম দীক্ষা। দীক্ষা-গ্রহণ না করিলে কোন কার্য্যে অধিকারী হইতে পারা যায় না।—

"অদীক্ষিতস্য মূঢ়স্য নিষ্কৃতি র্নাস্তি নিশ্চিতম্।
সর্ব্বকর্ম্মস্বনর্হস্য নরকে তৎপশোঃ স্থিতিঃ॥"

অদীক্ষিত মূঢ় ব্যক্তির কদাচ নিষ্কৃতি লাভ হয় না—তপ, জপ ব্রতাদি কোন কর্ম্মের অধিকারী হয় না। পরন্তু সেই নর-পশু মৃত্যুর পর নরকে গমন করিয়া থাকে।

মন্ত্র গ্রহণ বা দীক্ষার পর সাধককে সেই মন্ত্রের ব্যবহার-বিধি শিক্ষা করিতে হয়। এইজন্যই দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, যিনি দীক্ষাগুরু হইবেন, তাঁহার নিকটেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের গুরুদেব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও গুরুর ধ্যান-প্রণামাদি সকলই একই ভাবে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, গুরু পৃথক্ দেহধারী হইলেও গুরুতত্ত্ব বা গুরুশক্তি পৃথক্ নহে - সকলেরই একই প্রকার। সাধক সেই গুরুতত্ত্বেরই ধ্যান-পূজাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন—অনিত্য নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দাসরূপে ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ সেইরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম প্রকাশ-স্বরূপেই ভজনা করিবেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর-চরণানুচর-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ
অভেদদৃষ্টিং তৎ প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে॥"

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমহাদেব ভগবানের অতি প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ, ভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

দীক্ষিত ব্যক্তি প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া আচমনপূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসনে উপবেশন করিবেন। পরে পুনরায় আচমনান্তে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলপদ্মে শ্রীগুরু-তত্ত্বকে ধ্যান করিবেন। গুরুর ধ্যান—

"ঐঁ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদল-শোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং॥
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদং॥"

অনন্তর মানসোপচারে পূজা করিবেন। এ পূজাপ্রণালীও ধ্যানময়ী; মনে মনে পাদ্যাদি কল্পনা করিয়া মন্ত্রপূত করত শ্রীগুরুর উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। দীক্ষাবিধির মধ্যে তাহার যে ক্রম লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই অনুসরণীয়। আবার অন্তর্যাগবিধানে অপর আধ্যাত্মিক পূজাও বিহিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে। যথা—

স্বীয় হৃৎপদ্ম - আসন, সহস্রারবিগলিত অমৃত—পাদ্য, মন—অর্ঘ্য, সহস্রারামৃত আচমনীয়, স্নানীয় ও পানীয়, দেহস্থ আকাশ-তত্ত্ব—বস্ত্র। ক্ষিতিতত্ত্ব—গন্ধ, চিত্ত—পুষ্প, ঘ্রাণ ধূপ, তেজ—দীপ, ভক্তি-সুধা—নৈবেদ্য, অনাহতধ্বনি—ঘণ্টাবাদ্য, ইন্দ্রিয়চাপল্য—নৃত্য, বায়ুতত্ত্ব চামর, সহস্রারপদ্ম—ছত্র, অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, প্রীতি, দয়া ও ক্ষমা এই পঞ্চভাবই পুষ্পাঞ্জলি।

এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া সাধক যথাসাধ্য ইষ্টমন্ত্র জপ করত যথোক্ত মন্ত্রপাঠান্তে প্রণাম করিবেন।

'ঐঁ'— গুরুবীজ। ইহার অর্থ এই যে—"সরস্বত্যর্থ ঐ শব্দো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।" অর্থাৎ "ঐ' শব্দের অর্থ সরস্বতী, এবং "ঁ" অর্থ দুঃখহারক। অতএব গুরুদেব বাক্যময় মন্ত্রদানে জীবের দুঃখ হরণ করেন।

গুরুগায়ত্রী,—"ঐঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে চৈত্যরূপায় ধীমহি তন্নোগুরুঃ প্রচোদয়াৎ।" ইহার অর্থ এই যে, আমরা গুরুদেবকে অবগত হই; তিনি আত্মান্তর্য্যামী স্বরূপ, তাঁহাকে ধ্যান করি, সেই গুরু আমাদের হৃদয়-মন্দিরে অভীষ্টতত্ত্বকে প্রকটিত করুন।

শ্রীগুরুর ধ্যানাদি সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরা ক্রম-নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র। সাধক নিজ গুরূপদেশ মতে উহা ব্যবহার করিবেন। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক, ইতঃপূর্ব্বে গুরুদেবের যে ধ্যান উক্ত হইয়াছে, উহা সাধক-দেহাভিমানে ব্যষ্টিরূপে শ্রীমদ্‌গুরুদেবের অর্চ্চনার ধ্যান। তদ্ভিন্ন রাগানুগত ভজনমার্গে সাধক নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনায় মঞ্জরীরূপা সখীরূপে যখন অর্চ্চন করেন, তখন ঐ ধ্যান ব্যবহার্য্য নহে। তৎকালে শ্রীসখীরূপা গুরুর ধ্যান করিতে হয়। তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ইহার পর ভক্তি-সাধনার তৃতীয় অঙ্গ বিশ্রম্ভসহকারে অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে—

৩। শ্রীগুরুসেবা।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি ও তাঁহার উপদেশের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার সেবা, তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন, পাদসম্বাহন, শ্রীচরণোদকপান প্রভৃতি দ্বারা গুরু-শক্তি শিষ্যে সংক্রমিত হইয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত।

কোন সংক্রামক-ব্যাধি সংসর্গের ফলে অনায়াসে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করে। কুলোকের সংসর্গে থাকিলে লোকের মনোবৃত্তিগুলিনও ক্রমশঃ কুভাবাক্রান্ত হইয়া উঠে। সুতরাং গুরুর যে উপদেশ বিরুদ্ধভাবব্যঞ্জক ও ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় এবং সাম্প্রদায়িক সাধুগণের অনুমোদিত না হয়, তাহা শিষ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তবে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীগুরুর তুষ্টি-সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। এমন কি তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও শ্রীগুরুর অপ্রিয় আচরণ করিবেন না; বরং কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ করিলে শীঘ্রই পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের নাম বলিবার আবশ্যক হইলে কেবল নামাক্ষর উচ্চারণ না করিয়া সাধক ব্রাহ্মণাদি হইলে "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ" এবং শূদ্রাদি হইলে "শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ" বলিয়া নামোচ্চারণ করিবেন।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, দম্ভ হিংসা, দুঃখ, নিদ্রা প্রভৃতি ভক্তিবাধক অনর্থগুলি জয় করিতে বহু প্রয়াস পাইতে হয়, কিন্তু দয়াল শ্রীগুরুদেবের এমনই অপার মহিমা—

"এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহঞ্জসা ভবেৎ ॥" শ্রীভাঃ

গুরুভক্তি দ্বারা জীব ঐ সমুদয়কে যথার্থরূপে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর-শৌচবৎ ॥" শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ জ্ঞান-দীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে তাহার সমুদয়

শাস্ত্র-শ্রবণ কুঞ্জর-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং।
গুরুর্য্যস্য ভবেত্তুষ্ট স্তস্যতুষ্টো হরিঃ স্বয়ং॥

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং গুরু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, অতএব যাঁহার প্রতি গুরু সন্তুষ্ট, তৎপ্রতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

অতএব শ্রীগুরুসেবা যে শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা ভগবান্ শ্রীমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

অগ্রে গুরুদেবের পূজা করিয়া পরে আমার অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ করিলেই সিদ্ধিলাভ করিবে, অন্যথায় নিষ্ফল হইবে। শ্রীগুরুসেবার এমনই আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য—এমনই অমানুষী প্রভাব, উহা দ্বারা ভগবদ্ভজনও সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—আগমে, পুরশ্চরণ ফলপ্রসঙ্গে—

যথা সিদ্ধরস-স্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্‌গুরোরেবং শিষ্যোবিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

যে প্রকার সিদ্ধরসের স্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিষ্য শ্রীগুরুর চরণান্তিকে থাকিয়া গুরুসেবার ফলে ভগবৎশক্তিতে পূর্ণ অর্থাৎ পরাভক্তি লাভে ধন্য হইয়া থাকেন। ভক্তিসাধনার চতুর্থ অঙ্গ—

৪। সাধুবর্ত্তানুবর্ত্তন।

সাধুগণের আচরিত শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত অনুকূল বিধিসমূহের অনুশীলন ও অনুষ্ঠান করাও একটী সাধনার অঙ্গ। কারণ সদাচার দ্বারা জীবনের কার্য্যাবলীকে নিয়মিত করিতে না পারিলে হৃদয়ে পবিত্রতার সঞ্চার হয় না এবং হৃদয় পবিত্র না হইলে ভক্তির উদয়ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বৈষ্ণবের আচরণীয় যে সকল বিধি নির্দ্দেশ আছে, তন্মধ্যে যেগুলি স্বসাম্প্রদায়িক সাধুগণ, মান্য করিয়া থাকেন, সেগুলির যথাসাধ্য অনুশীলন ও অনুসরণ করিতে হইবে। কোন কারণে আত্যন্তিক কৃষ্ণভক্তির উদয় হইলেও শাস্ত্রীয় বিধির অবজ্ঞায় তাহা প্রায়শঃ উৎপাতের কারণই হইয়া থাকে। সদাচার ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, সুতরাং সকল বিষয়েই সদাচার আবশ্যক। –

"তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদ্‌গতিমাত্মনঃ।'

অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় ভাগবতী-গতির কামনা করেন তিনি অবশ্য সদাচার পালন করিবেন। এইরূপ সদাচার-নিষ্ঠা হইতে ভক্তির পঞ্চম অঙ্গ।—

৫। সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা

অর্থাৎ ভজন রহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। সাধুগণ কি উপায়ে ভগবদ্ভক্তিলাভ করেন - কিরূপে জীবের সদ্গতিলাভ হয়, এই সকল তত্ত্ব কথা জানিবার জন্য সাধকের হৃদয়ে এক অদম্য স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। এই স্পৃহাই ক্রমে ব্যাকুলতায় পরিণত হয়। শেষে সাধকের হৃদয়ে দীনতার পরাকাষ্ঠা প্রকটিত করে। এই

অবস্থায় সাধক ব্যাকুলভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হইয়া আত্মত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসু হন। এই সদ্ধর্ম্ম স্পৃহা হইতেই ভক্তি-সিদ্ধি শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। যথা—

"সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতি।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষা মভীপ্সিতিঃ॥"

সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মসম্বন্ধে 'জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যাঁহাতে মতি আগ্রহশালিনী হয়, তাঁহাদিগের অভিলষিত সকল অর্থই অচিরে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপে সাধন-স্পৃহা যতই বলবতী হয়, ততই বিষয় ভোগ-স্পৃহা হ্রাস পাইতে থাকে। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কৃষ্ণ-ভজনের মোহন আকর্ষণে যতই আকৃষ্ট হয়, তাহাদের ভোগৈশ্বর্য্যের আসক্তি ততই টুটিয়া যায়। এইরূপেই ভক্তির ষষ্ঠ অঙ্গ—

৬। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ভোগাদিত্যাগ।

বিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিলাভের নিমিত্ত ভোগাদি-ত্যাগ একান্ত প্রয়োজন। ভোগে লালসার প্রবাহ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ব স্ব বিষয়ভোগে ক্রমশঃ বলবান্ ও অদম্য হইয়াই উঠে; কিন্তু চঞ্চল চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে একাগ্র না হইয়া কেবল বিষয়-রসাস্বাদেই বিভোর হয়। এই "ভোগাদিত্যাগ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞাই আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য। যথা—শ্রীচরিতামৃতে—

"গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥"

* * * * *

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উদ্দেশে ভোগাদিত্যাগ হইতেই জীবের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন সাধক সংসারে গৃহ-কারাগারে অবস্থান করিতে যথার্থই কষ্টানুভব করিয়া থাকেন। তখন ভক্তির সপ্তম, অঙ্গ—

৭। দ্বারকা-গঙ্গাদি তীর্থ সমীপে বাস

করিবার স্পৃহা কিম্বা তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে। তীর্থস্থানে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-চিহ্নাদি, ও তথাকার পবিত্র কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া, সাধুগণের মুখে তীর্থ-কাহিনী ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণের সঙ্গগুণে সাধকের তামস ভাবগুলি দূরীভূত হইয়া যায়, হৃদয় ও মনের পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শ্রীভগবচ্চরণ-স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই তীর্থ-সেবার ফল। ইহাতে ভক্তি ও নিষ্ঠা সুদৃঢ়া হইলে ভক্তির

৮। যাবদর্থানুবর্ত্তিত

উপস্থিত হয় অর্থাৎ পান, ভোজন, জপ, পূজা প্রভৃতি সকল বিষয়েই এমন একটী নিয়ম করিতে হইবে, যাহা শত বাধা শত অসুবিধা সত্বেও প্রতিদিন সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তাই, নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥"

অর্থাৎ যে প্রকার নিয়মানুষ্ঠান করিলে স্ব স্ব ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ ব্যক্তি সেই মত নিয়মই স্বীকার করিবেন। কারণ, নিয়মের আধিক্য বা ন্যূনতা ঘটিলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। সুবিধা-অসুবিধার অনুরোধে ভক্তি-অঙ্গের নিয়মভঙ্গ হইলে দৃঢ়তা নষ্ট হয়, চিত্তের একাগ্রতা ও সাধনের ভিত্তি নিষ্ঠা শিথিল হইয়া যায়। অতএব যে নিয়ম করিতে হইবে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলেই ভক্তির নবম অঙ্গ।

৯। শ্রীহরিবাসর সম্মান (১)

অর্থাৎ শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি শ্রীহরির ব্রত-কৃত্য গুলি ভক্তের প্রাণতুল্য প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীএকাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি শ্রীহরির স্মারণী তিথি। সুতরাং এই সকল ব্রত দিবসে উপবাস করিলে ভক্তির অনুশীলন বৃদ্ধি পায়। এস্থলে উপবাস শব্দ লঙ্ঘন বা অনাহার বুঝায় না। সমস্ত পাপ হইতে বিরত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনাদি করিয়া কালাতিপাত করাই প্রকৃত উপবাস। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন -"যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং।" অর্থাৎ সৎসঙ্গ যেরূপ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে সেরূপ "ন রোধয়তি মাং যোগঃ, ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি ইত্যাদি, অর্থাৎ যোগ, ব্রতাদি

---

(১) শ্রীএকাদশী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্যতত্ত্ব মৎ-প্রণীত "শ্রীগৌর-উপদেশ" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। এই বাক্যে অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে, যদি সৎসঙ্গের ফলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব ব্রতপালনের আর আবশ্যকতা কি? এস্থলে এরূপ আশঙ্কা সঙ্গত বোধ হয় না। একের ফলাতিশয়-সামর্থ্যের প্রশংসা দ্বারা অন্যের নিত্যত্ব নিরাকৃত হইতে পারে না। ভক্তি-অধিকারিগণ যেরূপ "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা" অর্থাৎ আমার পূজা হইতেও ভক্তের পূজা বড়--এই কথা শুনিয়াও দীক্ষা-গ্রহণান্তর পূজার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা হেতু ভগবৎ-পূজা পরিত্যাগ করিতে কদাচ সমর্থ হন না। তদ্রূপ একের প্রশংসায় অন্য বৈষ্ণব-ব্রতাদি পরিত্যাগ সঙ্গত হয় না। শাস্ত্রে বিষ্ণু-প্রসাদ মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে—

"ষড়্‌ভি র্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎফলং ভুঞ্জতাং কলৌ ॥"

অর্থাৎ ছয়মাসকাল উপবাসের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ গ্রাসমাত্র গ্রহণেই তৎফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই বাক্যে শ্রীএকাদশীর নিত্যত্ব খণ্ডিত হইতে পারে না। যে হেতু, উক্ত বাক্য মহাপ্রসাদের-মাহাত্ম্য-বাচক, শ্রীএকাদশীর নিত্যত্ব-বাধক নহে। অতএব নিত্যত্ব-রক্ষণার্থ তাদৃশ বৈষ্ণব ব্রতপালন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্তির দশম অঙ্গ—

১০। ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব রক্ষা

অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সম্মান করা ভক্তির বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহারা সকলেই ভগবানের তনু স্বরূপ।

ইঁহাদিগকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম, পূজা ও ধ্যান করিলে মনুষ্যের অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়। অশ্বত্থ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ। যথা শ্রীভগবদ্‌গীতায়—

"অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।"

সাধারণতঃ বৈশাখাদি মাসে অশ্বত্থ মূলে জল ধারা দান করিয়াই ইহার সম্মাননা করা হইয়া থাকে। জল দান মন্ত্র। যথা—

"চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্ন-দর্শনম্।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশু মে॥
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥"

অস্যার্থ।—হে অশ্বত্থ! তুমি আমার চক্ষুঃ স্পন্দন, বাহুস্পন্দন দুঃস্বপ্ন দর্শন ও শত্রুগণের অভ্যুত্থান শীঘ্র প্রশমিত কর। তুমি অশ্বত্থরূপী ভগবান্ জনার্দ্দন, আমার প্রতি প্রীত হউন।

প্রণাম মন্ত্র। যথা—

"ওঁ অশ্বত্থ বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।
বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥"

শ্রীতুলসী ও ধাত্রীর মাহাত্ম্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যথেষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাহুল্য বোধে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য কেবল তৎপূজার্চ্চন-বিধিই এস্থলে লিখিত হইল। সাধক স্নানান্তে শুচি হইয়া প্রথমে শ্রীতুলসী দেবীকে ধ্যান করিবেন। ধ্যান মন্ত্র; যথা—

"ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশীমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র কল্লাঙ্গ যষ্ঠিং।

ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং ॥"

অস্যার্থ।— যাঁহার নবীন চন্দ্রের ন্যায় বদন, পক্ক বিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, অতিশয় দীপ্তিমতী, স্তনভারাবনত দেহ-কল্প-লতিকা, চন্দ্রসূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল-নয়ন এবং যিনি শ্বেতাঙ্গী, অভয় বরদা, মৃদুহাস্য-যুক্তা সেই শ্বেতপদ্মাসনস্থিতা শ্রীতুলসী দেবীকে ধ্যান করিবে। অনন্তর "এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রী৺-তুলসী দেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্য প্রদান করিবেন। তৎপরে অর্ঘ্যদান করিবেন। তন্মন্ত্র ; যথা—

"শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥"

ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রী৺তুলসী দেব্যৈ নমঃ। ইদমাচমনীয়ং ওঁ শ্রী৺-তুলসীদেব্যৈ নঃ। অতঃপর স্নান করাইবেন। স্নান মন্ত্র ; যথা—

"গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্য-কারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনীম্ ॥"

পরে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। পূজার মন্ত্র, যথা—

"নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে ॥"

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ নৈবেদ্য "ইদং শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদং সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ শ্রী৺তুলসীদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবেন। তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবেন -

"ন পূজা ন জপো যজ্ঞো ত্বয়া বিনা ভবেচ্চ ন।
প্রসন্না ভব দেবেশি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনি ॥

পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈরচ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
প্রসন্না ভব দেবেশি বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ ॥"

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তদীয় মূলদেশ হস্তদ্বারা বিলেপন করিবেন। যথা—

"ত্বন্মূলে সর্ব্বতীর্থানি ত্বৎপত্রে সর্ব্বদেবতা।
ত্বদঙ্গে সর্ব্বপুণ্যানি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনি ॥"

ইহার পর প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য। নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তুলসীকে নিজ দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরে কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণাঃ পদে পদে ॥"

অতঃপর দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন প্রণামের মন্ত্র যথা—

"ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥"

অন্যবিধ প্রণাম মন্ত্র ; যথা—

"যা দৃষ্টা নিখিলাঘ সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি ফলদা তস্মৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥"

ইহার অর্থ এই যে,—যাঁহাকে দর্শন করিলে নিখিল পাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, প্রণাম করিলে ব্যাধি সমূহ বিদূরিত হয়, জলদ্বারা সিক্ত করিলে শমন ভয় তিরোহিত হয়, রোপণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ ঘটে এবং শ্রীকৃষ্ণে

অর্পণ করিলে যিনি বিমুক্তিফল অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন সেই শ্রীতুলসীদেবীকে নমস্কার করি।

ধাত্রী অর্থাৎ আমলকীর মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অশ্বত্থ বৃক্ষাদির ন্যায় এই পুণ্যতরু ধাত্রীরও সম্মাননা করা কর্ত্তব্য। শ্রীতুলসীমালার ন্যায় ধাত্রী ফল ও কাষ্ঠ-সম্ভবা মালা ধারণেরও নিত্যতা আছে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ধাত্রীবৎ নৃণাং ধাত্রী মাতৃবৎ কুরুতে কৃপাং।
দদ্যাদায়ুঃ পয়ঃ পানং স্নানাদ্বৈ ধর্ম্ম-সঞ্চয়ম্॥
তস্মাত্ত্বং কুরু বিপ্রেন্দ্র ধাত্রী স্নানং হি যত্নতঃ।
প্রপাস্যসি হরের্ধাম দেবত্বং প্রাপ নারদ॥"

হে বৎস নারদ! ধাত্রী মাতৃবৎ কৃপা করিয়া থাকে, ধাত্রী রসপানে আয়ুবৃদ্ধি এবং উহাকে স্নাপিত করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব বিপ্রেন্দ্র! যত্নপূর্ব্বক ধাত্রীদেবীকে অভিষিক্ত কর, দেবত্ব প্রাপ্ত হও, পরে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিবে।

"যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রী ফলং মুনে।
প্রিয়ো ভবতি বিষ্ণোঃ স প্রনুষ্টানাং কা কথা॥"

যে বৈষ্ণব ইহলোকে ধাত্রীফল ধারণ করেন তিনি শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকেন।

"ধাত্রীফলকৃতাং মালা কণ্ঠস্থাং যো বহেন্ন হি।
স বৈষ্ণবো ন বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তিপরোঽপি চ॥
ন ত্যাজ্যা তুলসীমালা ধাত্রীমালা বিশেষতঃ॥"

যিনি ধাত্রীফল-নির্ম্মিতা মালা কণ্ঠে ধারণ না করেন তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলেও তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। এই

জন্যই তুলসীমালা ও ধাত্রীমালা পরিত্যাজ্যা নহে। তুলসী পত্রের ন্যায় ধাত্রীপত্র দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিহিত হয়। যথা—

"পবিত্রৈর্নূতনৈঃ পত্রৈর্ধাত্র্যা যঃ পূজয়েদ্ধরিম্।
স মুক্তোঃ পাপজালেন সাযুজ্যং লভতে হরেঃ॥"

যে ব্যক্তি পবিত্র নূতন ধাত্রীপত্র দ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া হরি-সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব—

"সর্ব্বদেবময়ী ধাত্রী বাসুদেবমনঃ প্রিয়া।
আরোপনীয়া সেব্যা চ সেচনীয়া সদা বুধৈঃ॥"

সর্ব্বদেবময়ী ধাত্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই সাধুব্যক্তিগণ ধাত্রীতরু রোপণ করিয়া নিত্য সেবন ও জল সেচন করিয়া থাকেন।

গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্যই শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। সুতরাং গো-ব্রাহ্মণ ভক্তগণের অবশ্য পূজ্য। হিন্দুমাত্রেই গো-সম্মান করিয়া থাকেন। গৌতমীয় তন্ত্র বলেন—

"গবাং কণ্ডুয়নং কুর্য্যাদ্ গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণং।
গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥"

গোরুর গাত্র কণ্ডুয়ন, গো-গ্রাসদান ও গো-প্রদক্ষিণ করিলে এবং গোরুর নিত্য প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে বা গোরুর প্রতি নিত্য প্রসন্নভাব প্রকাশ করিলে শ্রীগোপালদেবও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

গো-গ্রাসদান, মন্ত্র—

"সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাব স্ত্রৈলোক্য মাতরঃ॥"

গো-প্রণাম মন্ত্র—

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেরীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মস্থতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"

আবার ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষা করা ভক্তমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বাবাজী ব্রাহ্মণের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা বড়ই অশুভ জনক। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ প্রকৃতই ভক্তি-বিনাশক। অভিমান, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বজীবকে সম্মান করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ, তাই, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।" শাস্ত্র আরও বলেন "যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ" অর্থাৎ যে কিছু পদার্থ আছে তৎসমুদয়কে শ্রীহরির বিভূতি জানিয়া প্রণাম করিবেন। এমনকি—"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্‌ভুবি চাণ্ডালাশ্ব-গো-খরান্" অর্থাৎ চণ্ডাল অশ্ব-গর্দ্দভাদিকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। এইরূপ সুনীচ ও মানদ হওয়াই যে ধর্ম্মের উপদেশ ও অনুশাসন, সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণের সমাদর না করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই অপরাধী। ব্রাহ্মণ যেরূপই হউন, ব্রাহ্মণ ভগবানের তনু স্বরূপ। সুতরাং বৈষ্ণব-সম্মানের ন্যায় ব্রাহ্মণ-সম্মানও ভক্তের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও শাস্ত্রে—"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায়, তাহাকে কদাচ দর্শন করিবে না, বলিয়া উক্ত হইয়াছে তথাপি তাঁহাতে কদাচ হেয় বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে। কারণ, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥"

ব্রাহ্মণ কোন পাপাচরণ করিলে, হিংসা করিলে এবং বহু শাপ প্রদান করিলেও আমার ভক্তগণ তাঁহার দ্রোহাচরণ করিবে না; পরন্তু সর্ব্বদা নমস্কার করিবে। তবে আশক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন-সম্ভাষণাদি নিষিদ্ধ, ইহাই তাৎপর্য্য।"

বিপ্রচরণোদক-পান মন্ত্র ;—

"ত্রিপাপ-হরণং শুদ্ধং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
পিবামি শ্রদ্ধয়া নিত্যং বিপ্রপাদোদকং শুভং॥"

বিপ্র-পদরজ-ধারণ মন্ত্র —

"সর্ব্বরোগহরং পুণ্য মায়ুবৃদ্ধিকরং পরং।
বিপ্রপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি বিমুক্তিদং॥"

ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈষ্ণবও ভাগবতী তনু। অতএব ভক্তি-সাধকের পক্ষে বৈষ্ণবমাত্রেরই সম্মান করা অতীব শুভ-জনক। তাই, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"তস্মাদ্বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিতোষণের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের পরিতুষ্টিবিধান করিবে।

ভুবন-পাবনক্ষম বৈষ্ণগণের অনন্ত মহিমা—তাঁহাদের সেবা-সঙ্গের অচিন্ত্য প্রভাব শাস্ত্রে বহুলরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে তৎসম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিক জানিবার আশা থাকিলে "শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণবজনের স্মরণ-সম্ভাষণে হৃদয় পবিত্র হয়। যথা,—ইতিহাস সমুচ্চয়ে—

"স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥"

ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল হইলেও তাঁহার স্মরণ, সম্ভাষণ বা পূজা

করিলে পবিত্র হওয়া যায়। আবার ভক্তের জাতি দোষ গ্রহণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। যথা—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥"

ভক্ত শূদ্র, নিষাদ চণ্ডাল যাহাই হউন, তাঁহাকে নীচজাতি মনে করিলে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়।

এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥"

যিনি চারিবেদ-পারদর্শী তিনি আমার ভক্ত নহেন, কিন্তু ভক্ত চণ্ডালই আমার প্রিয়। সেই ভক্ত চণ্ডাল হইলেও দানের পাত্র, তাঁহার নিকট উপদেশও গ্রহণীয়। যেহেতু, তিনি আমার ন্যায় পূজ্য—সম্মানার্হ।

বৈষ্ণব সদাচারী বা মিথ্যাচারী যাহাই হউন না কেন বৈষ্ণব-পূজক তাহার কোন বিচারই করিবেন না। যথা—গরুড়পুরাণে—

"বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥"

বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হইয়াও যদি অসদাচারী ও আশ্রম-বিহীন হয়েন তাহা হইলেও তিনি সূর্য্যের ন্যায় নিখিল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-দর্শনমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন, প্রণাম, স্বাগত, আসনাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করা বিধেয়। বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে পরস্পর দর্শন হইলে ভূমিতে দণ্ডবৎ

পতিত হইয়া প্রণাম করিতে হয়। কারণ, ভগবান্ উভয়েরই হৃদয়স্থ। তবে,—

"সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥"

অর্থাৎ সভায়, যজ্ঞশালায়, দেবমন্দিরে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্র, যথা—

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমো॥"

বৈষ্ণবপদরজঃ গ্রহণ মন্ত্র, যথা—

"সর্ব্বানর্থহরং শুদ্ধং সর্ব্বাভীষ্ট প্রপূরকং।
ভক্তপাদরজো নিত্যং ভক্ষয়ামি সুভক্তিদং॥"

বৈষ্ণব-পাদোদক পান মন্ত্র, যথা—

"হরিভক্তিপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
ভক্ত-পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥"

এই যে গুরু-পদাশ্রয় হইতে দশটী সাধনাঙ্গ কথিত হইল, ইহাই ভক্তি-সাধনার প্রারম্ভরূপ। এই সকল সাধনাঙ্গের অনুশীলনের ফলেই সাধকের হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সময়ে ভক্তি উদয়ের বিঘ্নকারী যে সকল নিষিদ্ধাচার আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ভক্তি-প্রবাহে বাধা উপস্থিত হয়।

নবম উল্লাস

—:*:—

অনর্থ-নিবৃত্তি।

ভক্তি-বাধক অনর্থের নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির সাধন-পথ নিষ্কণ্টক হয় না। সাধনমার্গে বহুশত বাধা-বিপত্তি আছে, তন্মধ্যে শাস্ত্রকারগণ যে প্রধান দশটী ত্যাজ্যরূপে সাধনার অঙ্গীভূত করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে—

"সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ॥
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদ বিবর্জ্জনম্।
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা॥
অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা।
সেবা-নামাপরাধানামুদ্ভাবাভাবকারিতা॥
কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষ বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা।
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখজনের সঙ্গ দূর হইতে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গ যেমন কৃষ্ণভক্তি উদয়ের মূল, সেইরূপ অসৎ সঙ্গ ভক্তিনাশের মূল। সুতরাং প্রথমতঃ—

১। অসৎ-সঙ্গত্যাগই

সাধকের একান্ত বিধেয়। দুঃসঙ্গই নরকের দ্বার। এইজন্যই নারদভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ।" অর্থাৎ প্রেম-সম্পত্তি লাভ করিতে হইলে বিষয়াবিষ্ট বা কুচরিত্র

ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কারণ, সঙ্গদ্বারাই একের গুণ-দোষ অপরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সুতরাং দুষ্টব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া দুষ্ট বিষয়ের আপাত-সুখকারিতা আলোচনা করিতে করিতে ক্রমেই তৎপ্রতি আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তির ফলেই চিত্ত দূষিত হইয়া যায়, তদ্ভিন্ন কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে কি কুৎসিত সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিলেও মনে কুভাবের উদয় হইয়া চিত্ত-বিকার জন্মায়। সুতরাং এগুলিও অসৎসঙ্গের অন্তর্গত। অতএব —

"অসদ্ভি সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্য কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃ পাতশ্চ জায়তে॥"

অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তাহাতে সর্ব্বার্থহানি হয় এবং মনুষ্যের অধঃপাত ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ ব্যক্তিই প্রকৃত অসৎ। তাহার সঙ্গ ত্যাগ করাই ভক্তি-সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। এক সভায় উপবেশন কি এক দোকানে দ্রব্য ক্রয়াদি করাকে সঙ্গ বলা যায় না, কোন ব্যক্তির সহিত আন্ত-রিক সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্যবহারের নামই সঙ্গ। যথা—

"দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"

পরস্পর আদান-প্রদান, গুহ্যবিষয়ের কথোপকথন ও ভোজ্য-ভোজনই প্রীতি অর্থাৎ ভালবাসার লক্ষণ। এই ভালবাসার বশে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিমুখ অসজ্জনের সঙ্গ করিলে সাধকের অনর্থ ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী, কপট বৈষ্ণব-চিহ্নমাত্র-ধারী, যাঁহারা বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এক নিষ্ঠ নহে, তাঁহাদিগকেও বহির্ম্মুখজনের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। যেহেতু, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব

লঘু হইয়া যায় এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়িতে থাকে ততই সাধকের ভক্তিনিষ্ঠা শিথিল হইয়া পড়ে। এই জন্যই কাত্যায়ন-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"বরং হুতবহ জ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্বব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাস বৈশসম্॥

বরং অগ্নির জ্বালাময়* পিঞ্জর মধ্যে বাস করা ভাল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখজনের সহিত বাস করা ভাল নয়।

দুঃসঙ্গই জীবের সর্ব্বনাশের কারণ। কামাদি-রিপুপ্রবাহ স্বতঃই জীবের অন্তর্দেশে প্রবাহিত হইয়া থাকে, উহা যদি আবার অসৎ-সঙ্গরূপ প্রবাহের সহিত সম্মিলিত হয় তাহা হইলেই সাগরের ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তখন উহা উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য।

বিষয়-ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে যে আসক্তি জন্মে সেই আসক্তিই কামের প্রসূতি। সুতরাং কামশব্দের অর্থ-বিষয় তৃষ্ণা বা বিষয় কামনা। কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কারণ কাম্যবস্তু লাভে বাধা উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধ জন্মিলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; সুতরাং মূঢ়তা রূপ মোহ উপস্থিত হয়। মোহ-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হইলে, হৃদয়ের ভাব-কুসুমগুলি একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়,—স্মৃতি-বিভ্রম ঘটে। সদসৎ কিছুই বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না—তখন বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হইলেই জীবের সব গেল—জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। দুঃসঙ্গই জীবের এই সর্ব্বনাশের মূল। অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ এবং যাহারা স্ত্রী-সঙ্গী অসাধু তাহাদের সঙ্গ দ্বারাও সাধন পথের বহুবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গংত্যক্ত্বা দূরতঃ আত্মবান্।

যে হেতু, উহাই নরকের দ্বার - "বদন্তি যা নরকদ্বারমস্য।" আবার নারদ-ভক্তি-সূত্রও বলেন—

"স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-বৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ং।"

সাক্ষাৎ অসৎসঙ্গ তো অবশ্য পরিহার্য্য; পরন্তু তাহাদের সেই অসৎ-স্বভাবের বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন করাও দোষাবহ। দুষ্টা রমণীর চরিত্র শ্রবণে মন পৈশাচিকভাবে অবশ্যই বিচলিত হইতে পারে। ধনীর চরিত্র আলোচনাতেও ধনোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে—প্রাণের মাঝে লোভের অনল প্রজ্জ্বলিত হয়। তখন ন্যায়, ধর্ম্ম, বিবেক, বিশ্বাস সকলই সেই লোভের অনলে আহুতি পড়ে। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন কি শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণদাসগণের সেবার জন্য যথা-প্রয়োজন অর্থ-সংগ্রহ করাও তদ্বিষয় শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। আর যাহারা নাস্তিক কুতার্কিক, ভগবদ্বহির্ম্মুখ তাহাদের চরিত্র-শ্রবণ যে একান্ত ভক্তি-পরিপন্থী তাহা বলাই বাহুল্য। অপিচ শত্রুর চরিত শ্রবণও ভক্তি-সাধনার একান্ত প্রতিকূল। শত্রুর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই মনে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। সাধকের হৃদয় তটস্থিত ভক্তির অমৃত উৎস ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়।

২। শিষ্যাদি দ্বারা অনুবন্ধ

অর্থাৎ অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য, সঙ্গী বা ভৃত্যরূপে গ্রহণ করাও ভক্তি-সাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ। অর্থলোভে বহু শিষ্য করা, ভক্তজন ব্যতীত বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ, কদাচ সাধকের মঙ্গল জনক হয় না। কাহারও সহিত নূতন বান্ধবতা করিতে হইলেও তিনি

কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ কি না, জানিয়া তবে তাঁহার সহিত বান্ধবতা-করা কর্ত্তব্য।

৩। মহারম্ভাদিতে অনুদ্যম

মঠ, মন্দির, আখড়াদি বৃহদ্ ব্যাপারে সহসা হস্তক্ষেপ করাও সাধকের ভজনের বিঘ্নজনক। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই অর্থ-সংস্থান অবসর ও জন-সাহায্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কি না, বিশেষ বিবেচনা করিয়া উদ্যম প্রকাশ বিধেয়। নতুবা কার্য্য-নাশ ও ভজন-পণ্ড উভয়ই হইতে পারে।

৪। বহু গ্রন্থকলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ

অবশ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যে সকল গ্রন্থ ভক্তি-প্রতিকূল, শুষ্ক তর্ক-জ্ঞান-নিষ্ঠ, সেই সকল গ্রন্থাভ্যাস কিম্বা কোন কোন গ্রন্থের আংশিক পাঠ করিলে হৃদয়ে নানারূপ তর্কবাদের উদয় হয়, সাধকের ভক্তি-নিষ্ঠার মূলে আঘাত লাগে। এই জন্যই ইহা বর্জ্জনীয়। তবে যে সকল গ্রন্থ ভগবদ্ভক্তির পোষক, যে সকল শাস্ত্রযুক্তি ভক্তির অনুকূল ও ভক্তি-নিষ্ঠার দৃঢ়তা-সম্পাদক, সে সকল গ্রন্থপাঠ সাধকের নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত বলেন—

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যা মুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ বহুশিষ্য করিবে না, বহুগ্রন্থাভ্যাস করিবে না, বহু-ব্যাখ্যাবাদ করিবে না এবং মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে, উদ্যোগী হইবে না। বহুশিষ্য-গ্রহণ-প্রথা দোষাবহ নহে,—কারণ এ প্রথা নিবারিত হইলে সম্প্রদায় নাশের আশঙ্কা আছে। তবে অনধিকারী বহুশিষ্য করিলে সম্প্রদায়ের জঞ্জাল বৃদ্ধিই হয়।

৫। ব্যবহার-কার্পণ্য

একান্ত বর্জ্জনীয়। যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহার সহিত অকপটে সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। কাহাকে অর্থ দ্বারা, কাহাকে পরিশ্রম দ্বারা, কিছু না থাকে মিষ্টবাক্য দ্বারাও সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলেই কৃপণতা আসে। ইহাও সাধকের অশুভজনক। অথবা—

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥"

অর্থাৎ অন্নবস্ত্রাদির অভাব বা বিনাশ হইলে তজ্জন্য ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই কর্ত্তব্য।

৬। শোকাদির বশবর্ত্তী

হওয়া ভক্তজনের কর্ত্তব্য নহে। শোক মোহের কারণ। শোক দ্বারা ভক্তি-চর্চ্চায় বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। শোকে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব শোকের ঝটিকায় যাহাতে চিত্ত-সংক্ষোভিত হইতে না পারে, সে বিষয়ে সাধকের সাবধান হওয়া উচিত। মাদকাদি সেবন বা অন্য কোন অনাবশ্যক অভ্যাসের বশবর্ত্তী হওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, তাহাতে ভজনের অনেক বিঘ্ন ঘটে। অথবা কোন অন্ধ-কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইলেও সাধনমার্গে বহু বিপত্তি উপস্থিত হয়।

৭। অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা

প্রকাশ সাধকের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। দেবতা সকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ বিভূতি স্বরূপ। সুতরাং অন্য দেবতার প্রতি

সম্মান প্রদর্শন না করিয়া অবজ্ঞা করা ভক্তি-সাধকের ঘোরতর প্রত্যবায়। জীবমাত্রেরই সমাদর করা যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী সার উপদেশ, তখন অন্যান্য দেবদেবীকে সম্মান করিতে হইবে না—ইহা কি যুক্তিযুক্ত কথা? শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন—

"হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

সতী রমণী যেমন শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-দেবরাদির প্রতি সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াও একমাত্র পতিকেই ভজনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া একমাত্র সর্ব্ব দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণভজনই কর্ত্তব্য।

অবজ্ঞায় আপনার অহমিকা বৃদ্ধি পায় তৃণাদপি সুনীচভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং দেবতাগণের যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তির প্রার্থনা করা, সাধকের পরম মঙ্গলজনক।

৮। প্রাণীমাত্রের উদ্বেগদান

অবশ্য পরিত্যাজ্য। সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ ভক্তির একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা প্রাণিগণের কোন প্রকার উদ্বেগ না জন্মে, তদ্বিষয়ে সাধক সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইবেন।

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশ স্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥"

পিতা যেমন পুত্রের প্রতি করুণ, সেইরূপ করুণভাবে যিনি প্রাণীমাত্রকেই কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন না করেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত

ভক্তের প্রতি ভগবান্ শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হন। এইরূপ ভূতপ্রিয়তার ফলে হৃদয়ের যে কোন হিংসার ভাব আশু তিরোহিত হয়। এই জন্যই ভক্তির সাগর শ্রীভাগবত উপদেশ দিয়াছেন—

৯। সেবা ও নামাপরাধ

পরিত্যাগ না করিলে, সাধকের ভক্তি-পথে অগ্রসর হওয়া সুদূর-পরাহত। অপরাধ অনাদর-মূলক। বরাহ পুরাণে লিখিত আছে—

"শ্রদ্ধায়োপহৃতং শ্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥"

আমার ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি আমাকে সামান্য জল-বিন্দুও উপহার প্রদান করেন, আমি তাহাতে যেরূপ তৃপ্ত হই, অভক্ত-প্রদত্ত ভূরি ভূরি উপহারেও আমার তাদৃশ পরিতৃপ্তি হয় না। অতএব যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, সেইখানেই অনাদর—যেখানে অনাদর সেই খানেই অপরাধ। শাস্ত্রকারগণ সেবাপরাধ ৩২ টী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

(১) যানে আরোহণ করিয়া কিম্বা পাদুকা পরিধান করিয়া ভগবানের মন্দিরে গমন, (২) সামর্থ্য ও সঙ্গতি সত্ত্বেও দেবতার উৎসব না করা, (৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট-লিপ্ত দেহে বা অশৌচাবস্থায় শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন বা ভগবদ্বন্দনাদি, (৫) একহস্তে প্রণাম, (৬) তাঁহার সম্মুখে অন্য দেবতার প্রদক্ষিণ, (৭) তাঁহার অভিমুখে পদ-প্রসারণ, (৮) বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন, (৯) তদীয় সম্মুখে শয়ন, (১০) তৎসমক্ষে ভোজন, (১১) মিথ্যা-ভাষণ, অর্থাৎ বৃথা বাক্যব্যয়, (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, (১৩)

পরস্পর কথোপকথন, (১৪) ক্রন্দন, (১৫) কলহ, (১৬) নিগ্রহ বা কাহাকে দণ্ডদান, (১৭) অনুগ্রহ (১৮) ক্রূরভাষণ, (১৯) পূজাদি সময়ে পশুলোমজাত বস্ত্রাদি ব্যবহার, (২০) পরনিন্দা, (২১) পরস্তুতি, (২২) অশ্লীল-ভাষণ, (২৩) অধোবায়ু ত্যাগ, (২৪) বিত্তশাঠ্য অর্থাৎ সামর্থ্য সত্বেও কোনরূপে সেবা নির্ব্বাহ, (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন বা পান, (২৬) যে কালে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া ভগবানে অর্পণ না করা, (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্ট ভগবানের সেবায় অর্পণ, (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পাশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সমক্ষে অন্যকে প্রণাম করা, (৩০) গুরুর স্তুতি না করা, (৩১) নিজমুখে নিজের স্তুতি, (৩২) দেবতানিন্দা। এই সকল সেবাপরাধ ব্যতীত আরও বহুবিধ অপরাধ হইতে পারে, ভক্তকে সেই সকল অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। তথাপি যদি কোনরূপে সেবাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে কি উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি।
অপরাধসহস্রেণ ন স লিপ্যেত কশ্চন॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণো যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবং।
তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্॥
দ্বাত্রিংশদপরাধশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥"

প্রতিদিন যে ব্যক্তি গীতাপাঠ করেন, কিম্বা সহস্রনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ৩২ টী অপরাধ ক্ষমা করেন। যিনি বিষ্ণু-দ্বাদশীদিনে জাগরণ করেন, যিনি তুলসীর স্তব করেন যিনি তুলসীর দ্বারা শ্রীশালগ্রামার্চ্চন করেন, শ্রীহরি তাঁহার ৩২টী অপরাধ ক্ষমা করেন। এতদ্ভিন্ন অপরাধ খণ্ডনের আরও একটী সুন্দর উপায় আছে - নামাশ্রয়। তাই, পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ পাংশলঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥"

জীব যতই কেন অপরাধ করুক শ্রীকৃষ্ণ-পদাশ্রয় করিলেই তাহার সেই অপরাধ নিচয় বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে পাষণ্ড শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হয়, নামাশ্রয়ের গুণেই সে সেই অপরাধ-কূপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়; এমন সর্ব্ব-সুহৃদ্ নামের নিকট যাহার অপরাধ হয় তাহার অধঃপতন তো অনিবার্য্য। সেবা-পরাধের ন্যায় বৈষ্ণবাপরাধও অবশ্য পরিহার্য্য। যথা —

"যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতীমাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥"

বৈষ্ণবাপরাধ ভক্তির মূলোৎপাটন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে সাধককে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ ৬ প্রকার। যথা —

"ঘ্নন্তি নিন্দন্তি বিদ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে দর্শনে হর্ষং ন যাতি পতনানি ষট্॥"

বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দ প্রকাশ না করা এই ৬টী অপরাধ, পতনের কারণ।

এই নিদারুণ অপরাধ খণ্ডনের উপায় এই যে,—"তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ যাঁহার নিকট অপরাধ করা হইয়াছে, তাঁহার প্রসন্নতা-সম্পাদন ভিন্ন এই অপরাধ-মোচনের আর কোন উপায় নাই। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা তাঁহার প্রীতি-উদ্দেশে দীর্ঘকাল শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করাও উক্ত অপরাধ মোচনের অন্যতর উপায়।

নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম শীঘ্রই হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। "নিরপরাধে নাম লৈলে দেন প্রেম-ধন।" হেলায় শ্রদ্ধায় যে কোনরূপে নাম গ্রহণ করিলেও বস্তু-শক্তির ন্যায় নিখিল পাপ ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু অপরাধ থাকিতে প্রেমের উদয় অসম্ভব। শ্রীনামগ্রহণই কৃষ্ণ-প্রেমলাভের মুখ্য সাধন। যথা—

"প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন॥"

অতএব নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকা সাধকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। নামাপরাধ ১০টী। যথা—

(১) সাধুনিন্দা সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা যে পতনের মূল তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরন্তু সাধু নিন্দা শ্রবণেও দোষ আছে। যথা—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বং স্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

যে ব্যক্তি ভগবানের বা তদ্ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া না যায়, সে সর্ব্বপুণ্যচ্যুত হইয়া অধোগামী হয়। অতএব যাহাদের সাধুনিন্দায় প্রবৃত্তি সাধুসঙ্গের অভাবে তাহাদের ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধি হয় না।

(২) শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে শিবাদি দেবতার নামকে পৃথক্‌ চিন্তা বা শিবাদি দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করাও অপরাধজনক। কারণ, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার হ্রাস হয় এবং নিষ্ঠাহ্রাস হইলে ভক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। তবে, শিবাদি দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি কি তেজঃ স্বরূপে সম্মাননা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-নিঃসৃত সুরধনীর পবিত্রধারা মস্তকে ধারণ করিয়া শিব যখন গঙ্গাধর নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানাও কর্ত্তব্য।—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"।

(৩) গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা।—ইহা যে একটা প্রবল অপরাধ তাহা বলাই বাহুল্য।

(৪) শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা। চারিবেদ ও তদনুগত ভাবত, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রেই হরিনামের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণিত আছে। সেই সকল শাস্ত্রের নিন্দা করিলে কদাচ ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয় না। কুর্ম্মপুরাণে-উক্ত হইয়াছে—

"দেবদ্রোহাদ্ গুরুদ্রোহঃ কোটি কোটি গুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটি গুণাধিকং॥"

অর্থাৎ দেব-দ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটিগুণ বেশী, আবার তদপেক্ষাও শাস্ত্র-নিন্দা ও নাস্তিকতা কোটিগুণে অপরাধজনক।

(৫) হরিনামের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে ভূরিভূরি কীর্ত্তিত আছে, বহির্ম্মুখ-লোকের প্রবৃত্তির জন্য যে ঐ সকল মহিমা বা ফলের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে। নামের অনন্ত ফল, অসীম শক্তি। সুতরাং যাহারা নামের এই মাহাত্ম্যকে কেবল প্রশংসাবাদ মনে করে, তাহারা ঘোর অপরাধী।

(৬) প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করাও একটা অপরাধ।

(৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।—যদিও নামের বলে কৃত পাপের বিনাশ সেই নাম দ্বারাই সাধিত হয়, তথাপি যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নামের বলে পরম পুরুষার্থ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-সান্দ্র সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া পরম ঘৃণাস্পদ পাপ-বিষয়ে প্রসক্ত হয়, ইহা তাহার পরম দৌরাত্ম্য বুঝিতে হইবে -তখনও তাহার হৃদয় শঠতায় পরিপূর্ণ - তখনও নাম-গ্রহণের উপযোগীরূপ পরিশুদ্ধ হয় নাই। এরূপ নামাপরাধ স্থলে নিরন্তর নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। ইহাতে হৃদয় বিশোধিত হইয়া ক্রমশঃ উত্তমাধিকার লাভের যোগ্য হয়।

(৮) ব্রত, দান, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায়াদি পুণ্য কর্ম্মের সহিত নামের সমতুল্যতা জ্ঞানও অপরাধজনক। ইহাও কর্ম্মজড় জীবের একটী ঘোরতর প্রমাদ। যখন—"বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং (পাদ্মে) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এক একটী নাম সকল বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন হরিনামকে একটী কর্ম্ম-বিশেষ মনে করা কি ঘোর প্রত্যবায় নহে ?

(৯) শ্রদ্ধাহীন জনের প্রতি নামোপদেশও একটী অপরাধ। "আমি আমার" এই বিষয়-ব্যাপারকেই যাহারা সর্ব্বস্ব মনে করে, তাহাদের প্রতি নামোপদেশ করিলে, নামের অনাদরই হইয়া থাকে। এই জন্যই ইহা অপরাধজনক।

(১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে অপ্রীতি নামে। নিষ্ঠার অভাব বশতঃই এইরূপ অপ্রীতি জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ইহাও একটী অপরাধ।

প্রমাদবশতঃ সাধকের এইরূপ নামাপরাধ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় —

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরানি চ॥'

কেবল অবিশ্রান্তভাবে নাম কীর্ত্তন করা ইহাই অপরাধ রূপ বন্ধন-মোচনের অমোঘ অস্ত্র। এইরূপ সেবা ও নামাপরাধ শূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনই শুদ্ধ ভক্তের একান্ত কর্ত্তব্য। পরন্তু

১০। কৃষ্ণতদ্ভক্ত-বিদ্বেষনিন্দাদি

'সহ্য করা বা অনুমোদন করা সাধকের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে, সুতরাং উহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। শ্রীকৃষ্ণনিন্দা বা তদ্ভক্তজনের নিন্দা শুনিয়া যদি হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা না জন্মে, তাহা হইলে উপাস্যদেব ও তদীয়-প্রিয়জনের প্রতি প্রীতির অভাবই সূচিত হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে, সেই বিদ্বেষ বা নিন্দাপূর্ণ কথাগুলি নিতান্ত অশ্রাব্য মনে করিয়া কর্ণরোধ করতঃ সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই সাধকের একান্ত বিধেয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুবিধি। যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদও করিতে পারেন।

পূর্ব্ব কথিত আরম্ভরূপ দশাঙ্গ এবং এই ত্যাজ্য দশাঙ্গ চতুঃষষ্ঠী অঙ্গের মধ্যে এই বিংশতি অঙ্গই সাধন ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। তন্মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটীই প্রধান। পরে যে সকল অঙ্গ কথিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ক্রিয়া-প্রধান। এজন্য পরবর্ত্তী উল্লাসে পৃথকভাবে বিবৃত হইল।

দশম-উল্লাস।

ভজন-ক্রিয়া।

২১। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ।

মালা-তিলক-ধারণই বৈষ্ণবচিহ্নধারণ ইহা ভক্তির একটী বিশেষ অঙ্গ স্বরূপ। মালাধারণ সম্বন্ধে তুলসী মালাধারণই বৈষ্ণবের পক্ষে অধিক প্রশস্ততম এবং ইহাই বৈষ্ণবাচারসম্মত। মালাধারণ না করিলে আশ্রমাচারের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, নিজেকে ভক্ত-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিব, অথচ ভক্তির অঙ্গ মালা-তিলক ধারণ করিব না, ইহা কি এক প্রকার দৌরাত্ম্য নহে? যদি বল "ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং"-ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের কারণ নহে—এ প্রমাণ ধর্ম্মের প্রাধান্য বোধক, ধর্ম্মচিহ্ন ত্যাগ-বাচক হইতে পারে না। তাহা হইলে শাস্ত্রে তুলসী-মালা ধারণের এরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইত না। গরুড় পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবাম্।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য নৈবাস্তি পাতকম্॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিতা মালা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ করেন, তাঁহাকে কোন পাতকই স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই তুলসী মালা ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ঘোর প্রত্যবায়—

"ন ধারয়তি যো মর্ত্যঃ তুলসীকাষ্ঠমালিকাম্।
তস্য পূজাং ন গৃহ্ণামি বিষ্ণুদ্রোহী চ সর্ব্বদা॥"

মনুষ্যমাত্রেই তুলসী-মালা ধারণে অধিকার আছে.। ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলে যে ব্যবস্থা, তুলসী-মালা পরিত্যাগেও সেইরূপ ব্যবস্থা। অতএব তুলসী-মালা ধারণ না করিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করে,—সে ব্যক্তি বিষ্ণুদ্রোহী শ্রীভগবান্ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণও আছে—

"যো হ বৈ তুলসীং কণ্ঠে ধারয়ন্ জপতি ধ্যায়তি পূজয়তি
বিষ্ণুং স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যভাক্ ভবতি স
মোক্ষভাক্ ভবতি পাপীয়ান্প্যপাপীয়ান ভবতীত্যাদি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর জপ, ধ্যান ও পূজা করেন তিনিই ভগবানের পরম প্রিয়তম, তিনিই পুণ্যভাক্ তিনিই মোক্ষভাক্ হন এবং পাপী হইলেও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। তুলসী-মালা ধারণের মন্ত্র, যথা—

"তুলসী-কাষ্ঠ-সম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু ভক্তজন-প্রিয়ম্॥"

এইরূপে তিলক-ধারণও যে সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্ট ভাবে আদেশ করিয়াছেন—

"প্রভু বলে কেন ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার॥

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে॥"

পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥"

অর্থাৎ যে মানবের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট না হয়, তাহাকে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে, দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া পবিত্র হইতে হয়।

দ্বাদশ স্থানে যে তিলক ধারণের বিধি আছে, উহা কেবল সাম্প্রদায়িক চিহ্ন মাত্র নহে। দ্বাদশাঙ্গে শ্রীভগবানের দ্বাদশ নাম ধ্যান করিয়া তিলক রচনা করিতে হয়—এবং সেই সঙ্গে ন্যাস করিতে হয়। ইহাতে চিত্তের স্থিরতা ও পবিত্রতা উপস্থিত হওয়ায় সাধকের জপ-পূজাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তিলক একরূপ স্থায়ী অঙ্গন্যাস বিশেষ। চিহ্ন-অঙ্কিত থাকায় এইরূপ ন্যাসের ফলও স্থায়ী হয়,—যখনই সেই চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি পড়ে অমনই সেই অঙ্গে ন্যস্ত দেবতার নাম স্মরণ পথারূঢ় হইয়া সাধকের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত করিতে চেষ্টা করে। এই জন্যই তিলক-ধারণ ভক্তির একটী অঙ্গবিশেষ,—এবং শাস্ত্রে ইহার নিত্যতা উক্ত হইয়াছে। বাহুতে বংশপত্রের ন্যায়, হৃদয়ে অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় এবং অন্যত্র তুলসীপত্রবৎ তিলক করিবেন। নাসিকামূল হইতে ললাটের কেশমূল পর্য্যন্ত ছিদ্রযুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেন। ইহাকেই শ্রীহরিমন্দির তিলক কহে। এই উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণভাগে সদাশিব এবং মধ্যভাগে বিষ্ণু অবস্থান করেন, সুতরাং মধ্যভাগ কদাচ লেপন করিবেন না। উর্দ্ধপুণ্ড্র ১০ অঙ্গুল

পরিমাণ হইলে উত্তম, ৯ অঙ্গুল পরিমাণ মধ্যম এবং ৮ অঙ্গুলি পরিমাণ কনিষ্ঠ। তিলক নখ দ্বারা স্পর্শ করিবেন না। তিলক কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা রচনা করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যথা —

"অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধিনী॥"

অনামিকা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, মধ্যমা পরমায়ু বর্দ্ধিত করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি-সাধন করে, তর্জ্জনী মোক্ষ সাধন করিয়া থাকে।

স্নানান্তে সাধক শুচি হইয়া পবিত্র আসনে উপবেশন করত সামান্যাচমন পূর্ব্বক শ্রীগোপীচন্দনাদি দ্বারা বৈষ্ণব-ভূষণে দ্বাদশ তিলক করিবেন। সামান্য আচমনের নিয়ম এই - প্রথমে -

"ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পরে —' ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ওষ্ঠদ্বয়, মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয় এই দ্বাদশস্থান স্পর্শ করিবেন। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে দ্বাদশ স্থানে স্ব স্ব গুরু-পর্য্যায়-চিহ্ন-বিশিষ্ট তিলক অঙ্কিত করিবেন। প্রথমতঃ ঋষ্যাদি পাঠ, যথা—

"ওঁ অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতিঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দো লক্ষ্মীনারায়ণো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনো অচ্যুতায়ন্বে বিনিয়োগঃ।"

ললাটে—ওঁ শ্রীকেশবায় নমঃ, উদরে—ওঁ শ্রীনারায়ণায় নমঃ, বক্ষঃস্থলে—ওঁ শ্রীমাধবায় নমঃ, কণ্ঠে—ওঁ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণ বাহৌ—ওঁ শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামপার্শ্বে—ওঁ শ্রীবামনায় নমঃ, বামবাহৌ—ওঁ শ্রীশ্রীধরায় নমঃ, বাম স্কন্ধে ওঁ শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে -ওঁ শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, কট্যাং— ওঁ শ্রীদামোদরায় নমঃ, অনন্তর হস্ত-প্রক্ষালন করিয়া—"ওঁ শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে দিবেন। তৎপরে সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখামূল স্পর্শ করিয়া এই কিরীট মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-কুণ্ডল-চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম হস্ত পীতাম্বরধর—শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল শ্রীভূমি সহিত সাত্মজ্যোতি-দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমোনমঃ।"

অনন্তর সদাচারসম্মত স্বীয় রুচি অনুসারে কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে ললাটে ও হৃদয়ে—শঙ্খ, চক্র ও নাম-মুদ্রা ধারণ করিবেন। দক্ষিণ বাহুমূলে—ওঁ সুদর্শনায় নমঃ" এবং বাম বাহুমূলে "ওঁ পাঞ্চজন্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে চক্র ও শঙ্খ মুদ্রা ধারণ করা কর্ত্তব্য।

২২। অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম-লিখন।

ইহাও একটী ভক্তির অঙ্গ। হৃদয়ে কি বাহুতে ভগবানের নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিলে যখনই তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িবে তখনই সেই ভগবানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হইবে। পরন্তু পুনঃ পুনঃ দর্শনে ইহা দ্বারা নামজপ ও ধ্যানও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

২৩। নির্ম্মাল্য ধারণ।

শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য,—তুলসী-চন্দন-পুষ্পাদি মস্তকে ধারণ ও অঙ্গে স্পর্শ করাও একটী ভক্তির অঙ্গ।

"নির্ম্মাল্যস্তু বহেদ্ যস্তু কোটীতীর্থফলং লভেৎ"।

নির্ম্মাল্য ধারণে কোটীতীর্থের ফল লাভ হয়। পরন্তু দেহগত অশেষ পাপ ব্যাধিও আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ নির্ম্মাল্য ধারণের ফলে দুরন্ত মায়ার প্রভাবও খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই ভগবানের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছেন—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিন দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

অর্থাৎ তুমি যে মাল্য, চন্দন, বসন, ভূষণ উপভোগ করতঃ পরিহার কর, সেই সমস্ত ধারণ ও উচ্ছিষ্ট-ভোজন করিয়াই আমরা তোমার মায়া-জয়ে সমর্থ হইব।

২৪। শ্রীভগবানের মূর্ত্তির অগ্রে নৃত্য।

করাও একটী ভক্তির অঙ্গ। যথা—

"নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশং।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে করতালি দিয়া নাচিতে থাকেন, তাঁহাদের দেহ-তরুস্থ পাপ-পক্ষীসকল উড়িয়া পলায়।

২৫। দণ্ডবৎ নমস্কার।

"এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।"—সুতরাং শ্রীভগবানের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করাও ভক্তির একটী বিশেষ অঙ্গ।—

যষ্টি ভূমিতে যেরূপ সরলভাবে পতিত থাকে সেই ভাবে প্রণাম করিবার নাম দণ্ডবৎ প্রণাম। পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণামও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম এবং বাহুযুগল, পদযুগল,

জানুযুগল, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। প্রণামের মহিমা অপরিসীম। যথা—

"একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃতৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণ-প্রণামী ন পুনর্ভবায়॥"

শ্রীকৃষ্ণকে একবার প্রণাম করিলে যে ফল হয়, দশটী অশ্বমেধেও সেরূপ ফল হয় না। দশাশ্বমেধকারীকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রণামকারীকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

প্রণামের নিয়ম এই যে, ভগবানের সম্মুখস্থ গরুড়কে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া বামদিকে প্রণাম করিতে হয়। শ্রীমূর্ত্তির অতি নিকটে প্রণাম কর্ত্তব্য। তিনবার এবং ততোঽধিক বারও প্রণাম করিতে পারেন। এক হস্তে কি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া প্রণাম নিষিদ্ধ। দেবতা ভেদে প্রণামের মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আছে। উদাহরণ স্বরূপ কেবল শ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রণামমন্ত্রই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র, যথা—

"ওঁ আনন্দলীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

দিব্য কনককান্তি, সুন্দর, মহাপ্রেমরসদাতা, আনন্দ লীলাময়-মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগন্মঙ্গলদায়ক, ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম।

শ্রীরাধার প্রণাম, যথা—

"তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীং।
বৃকভানু-সুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াং॥"

অন্যান্য প্রণামাদি অর্চ্চন প্রকরণে বিবৃত হইবে।

২৬। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই গাত্রোত্থান।

করাও একটী ভক্তির অঙ্গ। ইহাতে ভগবানের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। ভগবানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং ইহাও ভক্তির কায়-গত অনুশীলন।

২৭। অনুব্রজ্যা।

শ্রীভগবানের উৎসবোপলক্ষে যখন শ্রীবিগ্রহকে উৎসব-স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই সময় ভক্তিসহকারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করাও একটী ভক্তির অঙ্গ।

২৮। তীর্থ-গৃহে গতি।

শ্রীধাম, মথুরা, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থস্থানে ও শ্রীমন্দিরে অর্থাৎ যেখানে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে তথায় গমন করাও একটী ভক্তির অঙ্গ।

২৯। পরিক্রমা।

শ্রীভগবান্‌কে ও শ্রীমন্দিরকে প্রদক্ষিণ করাও একটী ভক্তির অঙ্গ। তাহার মাহাত্ম্য এইরূপ—

"চতুর্ব্বারং ভ্রমীভির্স্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাদিকম্॥"

শ্রীভগবান্‌কে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর নিখিল জগৎ প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তাহাতে তীর্থপর্য্যটন অপেক্ষাও অধিক ফল

লাভ হয়। এইরূপ প্রদক্ষিণ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বহুতর কীর্ত্তিত হইয়াছে। একবার প্রদক্ষিণ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সূর্য্যাদির প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ।

প্রদক্ষিণ মন্ত্র, যথা—

"হে কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত গোবিন্দ মধুসূদন।
প্রদক্ষিণং করোমি ত্বাং করুণাঙ্কুরু মাধব॥"

৩০। অর্চ্চন

বৈধ ভক্তদের পক্ষে একটী বিশেষ ভক্তি অঙ্গ। বদ্ধজীব শরীরধারী, সুতরাং যাহাতে শরীরেরও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা না ঘটে, এবং শারীরিক সকল কার্য্যই ভগবদ্ভাব-মিশ্রিত হইয়া ভগবদনুশীলনের পুষ্টিসাধন করে, এই উদ্দেশ্যেই নৃত্য, প্রণাম, প্রদক্ষিণাদি ভক্তির অঙ্গগুলি বিহিত হইয়াছে। উপকরণাদি সহিত ভগবৎ পূজারূপ অর্চ্চন দ্বারা কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ অনুশীলন বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শারীরিক ক্রিয়াগুলিতে মনেরও ক্রিয়া আছে। অচ্চনের লক্ষণ—

"শুদ্ধিন্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গ কর্ম্মনির্ব্বাহপূর্ব্বকম্।
অর্চ্চনন্তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্॥"

অর্থাৎ ভূতাদি-শুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহপূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা উপচার সমর্পণকেই অর্চ্চনা কহে। আগমোক্ত আবাহনাদি বিধান ক্রমেই এই অর্চ্চন বা পূজাঙ্গ সিদ্ধ হইয়া থকে। যদিও ভাগবত মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই; কারণ অর্চ্চন ব্যতিরেকে শরণাপত্তি প্রভৃতি একতর দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি যাঁহারা শ্রীনারদাদি প্রবর্ত্তিত বর্ত্মানুসারে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ

স্থাপনের নিমিত্ত দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেই দীক্ষা-বিধানে অর্চ্চনের অবশ্য আবশ্যকতা আছে। যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহার নামই দীক্ষা। শ্রীমন্ত্রে ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান এবং সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ জ্ঞানের নামই এস্থলে দিব্যজ্ঞানের নিরুক্তি। সম্পত্তিবান গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাপ্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিত্তশাঠ্য করা হয়। নিজে আলস্যবশতঃ পূজা না করিলে কি অপরের দ্বারা তাহা সম্পাদন করিলে কেবল অশ্রদ্ধাই সূচিত হয়। এইজন্য গৃহস্থের পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মের দেবতাযাগরূপ শাখাপল্লবাদির সন্তোষ বিধানার্থ মূলসেকরূপ ভগবানের অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা প্রত্যবায় আছে। যথা স্কন্দপুরাণে—

'কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্য মভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতং॥"

যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বিদ্যমান নাই, তাহার অন্ন কদাচ ভক্ষণীয় নহে;—কারণ তাহা অভক্ষ্য সদৃশ। দীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই পূজা কর্ত্তব্য, নতুবা নিরয়গামী হইতে হয়। যথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্নরকানি ব্রজেন্নরঃ॥"

প্রত্যহ শ্রীহরির পূজা একবার, দুইবার বা সমর্থ হইলে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে। পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরকে যাইতে হয়।

যাঁহারা পূজা করিতে অশক্ত তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। যথা—

"পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥"

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা দর্শন করেন বা শ্রদ্ধা-সহকারে অনুমোদন করেন তিনি পঞ্চরাত্রাদি কথিত ক্রিয়াযোগের ফললাভ করেন।

কাহারও মতে এস্থলে মানসপূজাও বিহিত হইয়াছে। মানস-পূজা সাধারণ সকলেই করিতে পারেন। মানসপূজা-বিধি ইতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে সংশয় হইতে পারে,- মন্ত্রও ভগবন্নামাত্মক। বিশেষ এই মন্ত্র কেবল নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও শ্রীভগবান্ কি শ্রীমদ্ ঋষিগণ দ্বারা উহাতে শক্তি-বিশেষ নিহিত এবং শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপাদক। পরন্তু কেবল নামও নিরপেক্ষভাবে পরম পুরুষার্থ ফল পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্রে নাম অপেক্ষা এমন কি অধিক ফল লাভ হয়, যাহার জন্য দীক্ষার অপেক্ষা করিতে হইবে? তদুত্তর এই যে, যদিও স্বরূপত কোন ভেদ নাই, তথাপি স্বাভাবিক দেহাদি সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের ঐ সকল কদাচার ও চিত্ত-বিক্ষেপ-সঙ্কোচের নিমিত্তই ঋষিপ্রভৃতি এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং সেই মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্র, প্রায়-শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। তাই ব্রহ্মযামলে উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি বর্ণিত স্ব স্ব অধিকারোচিত বিধিপালন না করিয়া ঐকান্তী হরিভক্তি হইলেও তাহা উৎপাত স্বরূপ হয়।

কেবল ও কর্ম্মমিশ্রভেদে অর্চ্চন দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দ্বারা অন্য দেবার্চ্চন ও পিতৃ-পূজা বিহিত হইয়াছে।

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্" এবং
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণ-ক্রিয়া" ইত্যাদি

শাস্ত্র বাক্যই ইহার প্রমাণ্। অপিচ শ্রীভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে গণেশ-দুর্গাদি আছেন, তাঁহারও বিশ্বক্সেনাদির ন্যায় শ্রীভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠ-সেবক। অপর মায়াশক্ত্যাত্মক যে গণেশ-দুর্গাদি আছেন, ইহারা তাঁহাদের হইতে স্বতন্ত্র। যেহেতু ইহারা শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্ত্যাত্মক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম দুর্গা। ইনি অখণ্ড রস-বল্লভা—অত্যন্ত দুঃখে ইঁহার প্রকৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়, এজন্যই সাধুগণ ইহাকে দুর্গানামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা নারদপঞ্চরাত্রে—

"জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতি রাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভি রখণ্ড-রস-বল্লভা॥"

এইজন্যই ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ তত্ত্ব কথিত হইয়াছেন। যথা, গৌতমীয় কল্পে—

"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব স।"

অতএব এই সকল পীঠাবরণকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবক জ্ঞানে অবশ্য পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অনন্যভক্তি-সাধকেরও কোন আশঙ্কার কারণ নাই। যথা—

"দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রেক্ষণাদিভিঃ॥"

কিন্তু পূজাঙ্গরূপে ভূতাদি পূজা বিহিত হইলেও শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে শুদ্ধার্চ্চনমার্গে তাহা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতা নহেন। পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামে শ্রীগুরু-পাদুকা পূজার বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অর্চ্চনমার্গে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অধিকারী।—

"এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানা মাশ্রমানাঞ্চ সম্মতং।
শ্রেয়সা মুত্তমং মন্যে স্ত্রী-শূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥"

সকলবর্ণের সকল আশ্রমীর পক্ষে এমন কি স্ত্রী ও শূদ্রাদির পক্ষেও এই অর্চ্চন পরম শ্রেয়। সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রাদিরও যে শ্রীবিষ্ণু পূজায় অধিকার আছে, তাহা "স্ত্রীনামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণো-রারাধনাদিষু" ইত্যাদি প্রমাণেই ব্যক্ত হইয়াছে। দীক্ষা-বিধানের দ্বারাই ইহাদের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং দেবার্চ্চনায় অধিকারী হইয়া থাকেন। এই অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার-প্রসঙ্গ "শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে" শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন অধ্যায়ে টীকা দ্রষ্টব্য। যাহাহউক অতঃপর সংক্ষেপে পূজা বিধি কথিত হই-তেছে। এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই এস্থলে বিবৃত হইল। এই প্রণালীতেই সাধক অভীষ্টদেবতার পূজা করিতে সমর্থ হইবেন।

সাধক স্নানান্তে শুচি হইয়া পূজার তৈজসাদি ও উপচার গুলি সংগ্রহ করিয়া পূজার স্থানে দেবমন্দিরে সন্নিবেশিত করিবেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বিশুদ্ধ দেহে ও বিশুদ্ধ বস্ত্রে পুষ্পতুলসী চয়ন করিতে হয়। তুলসীপত্র চয়নের মন্ত্র;—

"তুলস্যমৃত জন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥"

তুলসী চয়নের পর, শ্রীতুলসীদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। তন্মন্ত্র, যথা—

"চয়নোদ্ভূত দুঃখঞ্চ যৎ হৃদি তব বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতঃ বৃন্দা দেবী নমোঽস্তু তে॥"

অমাবস্যা পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ। তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে বৈষ্ণবজন দ্বাদশীতেও চয়ন করিতে পারেন। সাধকের সামর্থ্য অনুসারে পূজার উপচার নির্ণীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ষোড়শোপচার, দশোপচার বা পঞ্চোপচারেই পূজা নিষ্পন্ন হয়। ষোড়শোপচার। যথা—১ আসন, ২ স্বাগত, ৩ পাদ্য, ৪ অর্ঘ, ৫ আচমনীয়, ৬ মধুপর্ক, ৭ আচমন, ৮ স্নান, ৯ বস্ত্র, ১০ অলঙ্কার ১১ গন্ধ, ১৩ ধূপ, ১৪ দীপ, ১৫ নৈবেদ্য ১৬ স্তুতিপাঠ।

দশোপচার।-১ পাদ্য, ২ অর্ঘ্য, ৩ আচমন, ৪ মধুপর্ক, ৫ আচমনীয়, ৬ গন্ধ, ৭ পুষ্প, ৮ ধূপ, ৯ দীপ, ১০ নৈবেদ্য।

পঞ্চোপচার। ১ গন্ধ, ২ পুষ্প, ৩ ধূপ, ৪ দীপ, ৫ নৈবেদ্য।

অনন্তর সাধক পবিত্র কুশ বা কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া 'আসন শুদ্ধি' করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কুর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। হ্রীং আধার শক্তয়ে নমঃ।

"পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতালোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে গন্ধ-পুষ্প প্রদান করিবেন। তারপর "জল-শুদ্ধি" করিবেন। তন্মন্ত্র যথা—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

এই মন্ত্রে অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা তীর্থ আহ্বান করিবেন। (দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, তাহা হইতে তর্জ্জনী ঈষৎ বক্রভাবে বহির্গত থাকিবে, ইহার নাম অঙ্কুশ মুদ্রা।)

অনন্তর যেভাবে উপবেশন করিলে শরীর মন সুস্থ থাকে সেই ভাবে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া (পদ্মাসনই উৎকৃষ্ট) উক্ত শুদ্ধীকৃত জলে আচমন করিবেন। বৈষ্ণব-আচমনের প্রণালী, যথা—

"বাম হস্তে এক মাষা পরিমাণ জল লইয়া তাহার তিন ভাগের এক ভাগ জল দক্ষিণ করে লইয়া ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ওঁ কেশবায় নমঃ" দ্বিতীয় ভাগ "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" তৃতীয় ভাগ "ওঁ মাধবায় নমঃ" বলিয়া জল পান করিতে হইবে। "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন, ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা দক্ষিণ ও বাম-পর্য্যায়ে ও অধর মার্জ্জন, ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ" বলিয়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ ও অধঃ ক্রমে দুইবার মুখ মার্জ্জন, "ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ" বলিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন, "ওঁ দামোদরায় নমঃ" বলিয়া ৩ বার মস্তকে জল-সেচন, "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অনামিকা-মধ্যমা-তর্জ্জনী দ্বারা মুখ স্পর্শ, "ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ ও বাম ক্রমে নাসিকা স্পর্শ, "ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ ও বামক্রমে চক্ষু স্পর্শ,

"ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ ও বামক্রমে কর্ণ স্পর্শ, "ওঁ অচ্যুতায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি স্পর্শ, "ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ, "ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা শিখামূল স্পর্শ, এবং "ওঁ হরয়ে নমঃ" "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া দক্ষিণ ও বামক্রমে বাহুমূল স্পর্শ করিবে। অশক্তের পক্ষে কেবল "শ্রীবিষ্ণু" স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেও আচমন সিদ্ধ হইবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।—

"ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥"

অনন্তর তিলকসেবা ও নাম মুদ্রাদি ধারণ করিবেন। ইহার প্রণালী ইতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ ভক্তগণের ভূতাপসারণ প্রয়োজন হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনমাত্র সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া থাকে। যথা—

"ভূতপ্রেত পিশাচাগ্যা যে সর্ব্বে বিঘ্ন-কারকাঃ।
অপসর্পন্তি তে তূর্ণং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

ভূতপ্রেত-পিশাচাদি যে সকল বিঘ্নকারী আছে, তাহারা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে শীঘ্র দূরে পলায়ন করুক।

ইহার পর ভূত-শুদ্ধি করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, ব্যোম এই পঞ্চভূতে মানবদেহ গঠিত অব্যয় ব্রহ্মশক্তি-সংযোগে সেই পঞ্চভূত সংশোধন করার নামই ভূতশুদ্ধি। ইহা না করিলে পূজা জপ প্রভৃতি ক্রিয়া নিস্ফল হয়, ভূতশুদ্ধি প্রধানতঃ চিন্তাময়। "সেই পরমাত্মাই আমি" এইরূপ

"সোহং" জ্ঞান বিশিষ্ট তেজোময় দেবতা স্বরূপে নিজেকে পরিচিন্তনই ইহার অঙ্গ। এই জন্য অনেক শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবী পূজায় ভূত-শুদ্ধির আবশ্যকতা বোধ করেন না। কিন্তু ভক্তি-সন্দর্ভাদি গ্রন্থে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

"এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট দেবতারূপত্বেন চিন্তনং
বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্॥"

এইরূপ যে যে স্থলে আপনাকে নিজাভীষ্ট দেবতাস্বরূপ চিন্তনের বিধান আছে, সেই সেই স্থলেই সাধক আপনাকে শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি বৃত্তি—বিশুদ্ধ সত্বাংশ বিগ্রহ পার্ষদ-সেবক স্বরূপে চিন্তা করিবেন। এক্ষণে সংক্ষেপে এই ভূতশুদ্ধি-বিধি কথিত হইতেছে।—

বামহস্ততল উত্তান ভাবে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ততল দ্বারা উহার উপর বন্ধন করিলে করকাচ্ছপিকা মুদ্রা হয়। এইরূপ মুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক দীপ-কলিকার ন্যায় জীবাত্মাকে চিন্তা করিয়া হৃৎপদ্ম হইতে মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্মে পরমাত্মার সহিত যোজনা করিবেন। শরীরস্থ পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব যেন সেই পরমাত্মায় লীন, এইরূপ ভাবনা করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ কুক্ষিতে অধোমুখে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে দর্শন করিয়া "যং" এই ধূম্রবর্ণ বায়ু বীজটী ১৬ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা রুদ্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক মনোদ্বারা ঐ বীজকে নাভিদেশে লইয়া যাইবেন এবং উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া ৬৪ বার জপ করিয়া কুম্ভক করিবেন এবং ৩২ বার জপ করিতে করিতে বাম

নাসা রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা-পথে বায়ু রেচন করিবেন। এই সময় চিন্তা করিবেন, বাম কুক্ষিস্থ পাপপুরুষ সহ ভৌতিক দেহ শুষ্ক হইয়াছে। তৎপরে "রং" এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাতে ১৬ বার জপ করিতে কবিতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ঐ বীজকে মূলাধারে লইয়া যাইবেন। অনন্তর ৬৪ বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক ও বাম নাসায় ৩২ বার জপ করিতে করিতে রেচন করিবেন। ইহাতে পাপপুরুষ দগ্ধ হয়। পরে "ঠং" এই শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজ ১৬ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া ঐ দগ্ধ জীবকে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত চন্দ্রমণ্ডলে লইয়া "বং" এই বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক এবং "লং" এই পৃথ্বীবীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচন করিবেন। ইহাতে উক্ত চন্দ্রমণ্ডল-নিঃসৃত অমৃতের দ্বারা পুনরায় দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর প্রাণশক্তিকে স্মরণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। হৃদয়ে হস্ত সন্নিবেশিত করিয়া পাঠ করিবেন—

"ওঁ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্রঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি ছন্দাংসি অতিছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যাদেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথীব্যপ্‌তেজো বায়্যাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দ স্পর্শ রূপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুজিহ্বাঘ্রাণাত্মনে ঊং শিখায়ৈ বষট্‌। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌-পাণি-পাদ-পায়ূ-পস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদান গমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাত্মনে অং

অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীং হৃদয়ান্নাভিঃ। ওঁ ক্রৌঁ মস্তকাদা হৃদয়ং। (অনন্তর হৃদয়স্পর্শ করিয়া) ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ। (দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া) ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ। (কুকুদ অর্থাৎ 'ঘাড়' স্পর্শ করিয়া) ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ। (বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া) ওঁ বং মেদাত্মনে নমঃ। (হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যন্ত) ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। (হৃদয় হইতে বাম হস্ত পর্য্যন্ত) ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। (হৃদয় হইতে দক্ষিণ পদ পর্য্যন্ত) ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ। (হৃদয় হইতে বামপদ পর্য্যন্ত) ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত) ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ। (হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত) ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ।

ইহার পর প্রাণশক্তির ধ্যান করা কর্ত্তব্য। যথা—

"রক্তাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণ-সরোজাধিরূঢ়াকরাগ্রৈ
পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথগুণভবমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবানাম্।
বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরূহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ।"

অস্যার্থ।—যিনি লোহিত সাগরস্থিত পোতের ন্যায় বিকসিত রক্তকমলোপরি উপবিষ্টা, যিনি হস্তে পাশ, ধনু, ইক্ষুদ্ভবগুণ, অঙ্কুশ, পঞ্চবাণ (সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপণ ও স্তম্ভন,) এবং যিনি রক্ত-কপাল ধারণ করিয়াছেন সেই ত্রিনয়ন-ললিতা, পীন-পয়োধরা প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা দেবী প্রাণশক্তি আমাদের শুভ-করী হউন।

এইরূপ ধ্যানের পর হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া বলিবেন—ওঁ আং হ্রীং ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হোং হংসঃ মমপ্রাণা ইহপ্রাণাঃ—পুনরায় এই বীজ উচ্চারণ করিয়া—"মম

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" এবং পুনরায় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "বাঙ্‌মন-স্তক্‌-চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহায়ন্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা" বলিবেন। অনন্তর জন্মাবধি ষোড়শসংস্কার সিদ্ধির নিমিত্ত ১৬ বার "ওঁ" উচ্চারণ করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই সাধকের দেহ-মন শুদ্ধ হইয়া থাকে। অসমর্থ হইলে কেবল ভাবনা দ্বারাই অর্থাৎ কুম্ভকাদি না করিয়াও ভূতশুদ্ধি সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত মায়াবদ্ধ ভৌতিক দশার অবসানে জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস্য জ্ঞান না জন্মে, ততদিন শ্রীহরির কৃপাসান্নিধ্য লাভের জন্য ভূতশুদ্ধি করা আবশ্যক। তবে যাঁহারা অনন্য-শরণ কৃষ্ণভক্ত — যাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণানন্দরসোন্মত্ত তাঁহাদের আর ভূতশোধনের প্রয়োজন কি? যাঁহারা ভূতশুদ্ধি করিতে একান্ত অশক্ত, তাঁহারা দ্বাদশবার "ক্লীং" এই কামবীজ জপ করিবেন।

অনন্তর পূজার দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দক্ষিণ পার্শ্বে স্নানের পাত্র ও তাঁহার নিকটস্থ আচমন পাত্র। নিজের সম্মুখে বামপার্শ্বে আধারের উপর শঙ্খ, তাহার নিকট আধারের উপর ঘণ্টা, নিজের বামে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও জলপাত্র। দক্ষিণে তুলসী গন্ধপুষ্পাদি, পাত্র ও ঘৃত-দীপ (তৈল দীপ হইলে বামভাগে রাখিতে হয়)। অন্যান্য পূজা সম্ভার নিজের দৃষ্টিমধ্যে রক্ষা করিবেন এবং হস্ত-প্রক্ষালন জন্য একটী পাত্র নিজের পশ্চাৎ ভাগে রাখিবেন। প্রথমতঃ শঙ্খস্থাপন।— ভূমির উপর জল দ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া আধারের সহিত শঙ্খ স্থাপন করিবেন। "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খ মধ্যে গন্ধপুষ্প ও তুলসী দিয়া "ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ" বলিয়া শঙ্খ জল

পূর্ণ করিবেন। পরে তদুপরি অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া কামবীজ (ক্লীঁ) উচ্চারণ পূর্ব্বক একটী তুলসীপত্র শঙ্খের উপর দিবেন। পরে ধেনু-মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ কামগায়ত্রী "ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি, তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।) - ১০ বার জপ করিবেন। (ধেনু মুদ্রা — উভয় হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর অভিমুখী করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার সহিত বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমাদির সহিত যোগের নামই ধেনু মুদ্রা।"

অনন্তর সেই শঙ্খ ধারণ করিয়া—

"ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্ব দেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোস্তুতে॥"

বলিয়া নমস্কারপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল পাদ্যপাত্রে ফেলিবেন। পরে শঙ্খস্থিত জল তুলসীপত্র দ্বারা স্নান-পাত্রাদি সমস্ত দ্রব্যে সিঞ্চন করিবেন।

অনন্তর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।—

"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণেহি হুঁ ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক

পুষ্পের উপর চন্দন বা গন্ধ নিক্ষেপ করিবেন। চন্দন, অগুরু ও কর্পূর এই তিন দ্রব্যের মিশ্রকে গন্ধ কহে। অতঃপর নিজের বামপার্শ্বে কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক আঁধারের উপর ঘণ্টা রাখিয়া "ওঁ জগদ্ধ্বনিত ভো মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" উচ্চারণ করিবেন। পরে "এতৎপাদ্যং, ইদমাচমনীয়কং, এতৎ স্নানীয়ং, এতে গন্ধপুষ্পে ঘণ্টায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবেন, এবং —

"সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ঘণ্টানাদস্তু কারয়েৎ॥"

বলিয়া বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইবেন।

অনন্তর প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহময়ী, চন্দনাঙ্কিতা, চিত্রপটময়া, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে সাধকের অভিলষিত কোন একটী প্রতিমাতে বা গৃহে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন। সর্ব্বাগ্রে গুরু-পূজা কর্ত্তব্য, তাহার প্রণালী ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই গুরুপূজার পূর্ব্বে সাধকের অঙ্গাদিন্যাস করা কর্ত্তব্য। **অঙ্গ-ন্যাস** কথিত হইতেছে। যথা—"ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা" এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠবর্জ্জিত করশাখা দ্বারা যথাক্রমে হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবেন। "গোপীজন শিখায়ৈ বষট্"—এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখাতে "বল্লভায় কবচায় হুং"—মন্ত্রে উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে এবং "স্বাহা" এই মন্ত্রে সর্ব্বদিকে ন্যাস করিবেন।

অতঃপর **করন্যাস** কথিত হইতেছে। যথা—"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা, করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোপীজনায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ইহার পর মন্ত্রের **ঋষ্যাদিন্যাস** বিহিত। যথা "অস্য শ্রীগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সকল লোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতা কামবীজং বহ্নিপ্রিয়া শক্তিঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থে বিনিয়োগঃ।

শিরসি ওঁ শ্রীনারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ সকল-লোকমঙ্গলায় নন্দতনয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতায়ৈ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।"

এই ত্রিবিধ ন্যাসই সাধকের কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে অন্ততঃ একটী ন্যাসও করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ন্যাস-প্রকরণ শ্রীঅষ্টা-দশাক্ষরীয় মন্ত্র সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজন বোধে শ্রীদশাক্ষরীয় গোপাল মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস-প্রকরণও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

মন্ত্র—"ক্লীঁ গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।"

ঋষ্যাদি স্মরণ,—"ওঁ দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ বিরাটচ্ছন্দঃ সকল-লোকমঙ্গলোনন্দগোপতনয়ো দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থ-সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদি ন্যাসঃ। শিরসি ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাটচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—সকল-লোকমঙ্গল-নন্দগোপতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ক্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। পুনর্হৃদয়ে—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতায়ৈ নমঃ।

অঙ্গন্যাস—ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বিচক্রায় স্বাহা শিরসে নমঃ। ওঁ সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্য রক্ষণ চক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। ওঁ অসুরান্তক চক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্য

রক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং। অসুরাক্রান্ত চক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অনন্তর সাধক আত্মস্বরূপ চিন্তা করিবেন। যথা—

"দিব্য শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তংপুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্ম নবাম্বরং বিলষতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ॥"

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবন-যোগপীঠের ধ্যান করিবেন।

"শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনা বেষ্টিতং শুভং।
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভিতং॥
নানাবর্ণৈঃ কুসুমিতং তদ্রেণু পরিপূরিতং।
ধ্যায়েচ্ছুদ্ধমনা নিত্যং গোবিন্দস্থান মধ্যয়ং॥"

পরে কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন।

"ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া সেই কূর্ম্ম-মুদ্রাভ্যন্তরস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় ধ্যান করত শ্রীমূর্ত্তিতে বা শ্রীশালগ্রামে হস্তস্থিত পুষ্প প্রদান করিবেন। অনন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং রত্নসার পরিচ্ছদং।
নানাচিত্র বিচিত্রাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥

"ইদমাসনং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া একটী পুষ্প প্রদান করিবেন।

(২) ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধয়ে।
তস্য তে পরমেশ্বব সুস্বাগতং মিদং বপুঃ॥"
ভো ভগবন্ কৃষ্ণ স্বাগতং সুস্বাগতং।

(৩) তাম্রপাত্রে জল গ্রহণ করিয়া—
ওঁ যদ্ভক্তি-লেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দ-সম্ভবঃ।
তস্য তে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥
এতৎ পাদ্যং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

(৪) পরে তিল, দূর্ব্বা, আতপ, যব ও পুষ্পযুক্ত জল কিম্বা কেবল জল শঙ্খাদি পাত্রে গ্রহণ করিয়া—

ওঁ তাপত্রয়হরং দেবং পরমানন্দ-সম্ভবম্।
তাপত্রয়-বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥"
এষঃ অর্ঘ্যঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।

(৫) পুনরায় জল গ্রহণ পূর্ব্বক—
ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধি হেতবে॥
ইদমাচমনীয়ং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" — বলিয়া তামকুণ্ডে দিবেন।

(৬) পরে ঘৃত, মধু, দধি কাঁসার পাত্রে গ্রহণ করিয়া—
ওঁ সর্ব্বকল্মষ হীনায় পরিপূর্ণ সুখাত্মনে।
মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥"
"এষ মধুপর্কঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ "বলিয়া মুখে দিবেন।

(৭) পুনঃ কিঞ্চিৎ জল লইয়া—

ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধি মাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং ॥"

ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

(৮) অনন্তর তাম্রাদিপাত্রে সচন্দন তুলসীপত্র চিৎভাবে রাখিয়া তদুপরি শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে পাঠ করিবেন —

ওঁ পরমানন্দধারাব্ধি নিমগ্ন নিজমূর্ত্তয়ে।
স্বাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশতে ॥

ইদং স্নানীয়ং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া শ্রীমূর্ত্তির মস্তকে তিনবার দিবেন। অনন্তর সূক্ষ্মবস্ত্রে শ্রীঅঙ্গের জল অপসরণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে পীঠাসনে একটী তুলসীর উপর স্থাপন করিবেন। শ্রীশালগ্রাম হইলে তদুপরি আর একটী তুলসী পত্র দিতে হইবে।

অনন্তর উত্তরীয় সহ বস্ত্র লইয়া —

(৯) ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজ গূঢ়োরুতেজসে।
নিরাবরণ বিজ্ঞান বাস স্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥
ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎ সম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কং ॥

ইদং সোত্তরীয় বস্ত্রং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

(১০) পরে স্বর্ণ রৌপ্যাদিময় ভূষণ অভাবে গন্ধপুষ্প লইয়া —

ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষাণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥

ইদমাভরণং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।

(১১) ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্য পরিপূর্ণ দিগন্তরং।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥
এষঃ গন্ধঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।

(১২) ওঁ তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণ-মনোহরং।

আনন্দ সৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং॥

ইদং পুষ্পং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।—তুলসী পত্র অর্পণের মন্ত্র।—"ওঁ নমস্তে বহুরূপায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে স্বাহা, ইদং সচন্দন তুলসী পত্রং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।" পরে এক একটী পুষ্প হস্তে লইয়া "ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া যথাক্রমে শ্রীমূর্ত্তির মস্তকে, ললাটে, ভ্রূ মধ্যে কর্ণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, নাসাপুটে, বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, বাম ও দক্ষিণ কটিতে, জানুদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে অর্পণ করিয়া অঙ্গ পূজা করিবেন। পরে মুখে—"বেণবে নমঃ"—সর্ব্বাঙ্গে "বনমালায়ৈ নমঃ" স্তনদ্বয়ে "শ্রীবৎসায় নমঃ" কণ্ঠে "কৌস্তুভায় নমঃ" বলিয়া উপাঙ্গ পূজা করিবেন।

(১৩) পরে তৈজস পাত্রে ধূপ রাখিয়া—

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।

আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥"

এষ ধূপঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।" বলিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে নিবেদন করিবেন।

(১৪) ওঁ স্বপ্রকাশো মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।

সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

এষঃ দীপঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আরতির ন্যায় একবার ঘুরাইয়া অর্পণ করিবেন।

(১৫) ওঁ সৎপাত্র শুদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেক ভক্ষণং।

নিবেদয়ামি দেবেন নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং॥

ইদং নৈবেদ্যং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া সমর্পণ করিবেন। অন্নব্যঞ্জনযুক্ত নৈবেদ্যার্পণের বিশেষ এই যে "নিবেদয়ামি ভবতে

জুষাণেদং হবির্হরে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা "বলিয়া জল গণ্ডূষ প্রদান করিবেন। পরে ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা," বলিয়া গ্রাস-মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর গৃহদ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া ১০৮ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। পরে দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আচমন করত "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া "ইদং আচমনীয়ং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবেন। "এতত্তাম্বূলং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ," ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবেন। অনন্তর "ইদং মাল্যং পুষ্পাঞ্জলিং ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া ৫ বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। পরে সেই সকল মহাপ্রসাদ নৈবেদ্যাদি দ্বারা শ্রীরাধার পূজা কর্ত্তব্য। শ্রীরাধার ধ্যান মন্ত্র, যথা—

"অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর সমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগগত মুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুত-কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহম্॥"

তন্মন্ত্র।—শ্রী৺ রাধিকায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা যথারীতি পূজা করিবেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য অর্পণ করিবেন। অতঃপর সখীগণের ধ্যান পূজাদির বিষয় "ব্রজপ্রেম ও উপাসনা" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। পূজান্তে সাধক স্বীয় ইষ্টমন্ত্র ১৮ বার কি ১০৮ বার জপ করিয়া গায়ত্রী ১০৮ বার জপ করিবেন। কেহ কেহ এই সময় যথাসাধ্য শ্রীহরিনাম জপের উপদেশ প্রদান করেন। জপান্তে—

ওঁ গুহ্যাতি-গুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করে জপ সমর্পণ করিবেন।

(১৬) স্তব পাঠ।—শ্রীকৃষ্ণাষ্টকাদি স্তব পাঠ করিয়া সাধক করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন—

"ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

অনন্তর প্রণাম কর্ত্তব্য। ইতঃপূর্ব্বে প্রণাম-মন্ত্র সকল উক্ত হইয়াছে। অনন্তর নীরাজন-আরাত্রিক করা কর্ত্তব্য। আরাত্রিকের নিয়ম এই যে, প্রজ্জলিত পঞ্চপ্রদীপাদি মূলমন্ত্র স্মরণ সহকারে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া বামকরে ঘণ্টা ও দক্ষিণ করে উক্ত দীপ ধারণ করত দক্ষিণপদ আসনে ও বামপদ ভূমিতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে ৪ বার, নাভিতে ২ বার, মুখে ১ বার ও সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার আরতি করিবেন। পরে তুলসী গরুড় ও বৈষ্ণবদিগের প্রীতির জন্য দ্বারের দিকে ১ বার ঘুরাইবেন।

অর্চ্চনার বিষয় যেমন বিপুল—তেমনই জটিল। বিশদভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচিত হইল। সহৃদয় ভক্ত-পাঠকবর্গ এজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। অনন্তর ভক্তির অবশিষ্ট অঙ্গগুলি বিবৃত হইতেছে।

৩১। পরিচর্য্যা।

রাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সেবার নাম পরিচর্য্যা। ইহা দ্বিবিধ। উপকরণাদি পরিষ্কার করা এবং চামরাদি দ্বারা উপাসনা।

৩২। গীত।

তালমানস্বরাদি সংযোগে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করাও একটী

ভক্তির অঙ্গ। "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ।

৩৩। সংকীর্ত্তন।

নাম লীলা গুণাদির উচ্চ উচ্চারণের নামই কীর্ত্তন। কীর্ত্তনের মহিমা শাস্ত্রে ভূরিভূরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধনার ক্রমোৎকর্ষ অনুসারে প্রথমতঃ নাম কীর্ত্তন, পরে গুণ কীর্ত্তন, রূপ কীর্ত্তন অবশেষে লীলা কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। কীর্ত্তন করিতে অশক্ত হইলে শ্রবণ করিবেন, তাহাতেও অসমর্থ হইলে অনুমোদন কর্ত্তব্য। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি দীনজনের প্রতি অপার করুণাময়ী। এই জন্যই দুর্ভাগ্য কলির জীবের প্রতি কীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিধর্ম্মই একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে। কলিতে কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। কলি-সঙ্গেই যে কীর্ত্তনের এরূপ গুণোৎকর্ষ, তাহা নহে। ভক্তি-বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্রের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। "চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।" কীর্ত্তন, স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ স্মরণ বহু আয়াসে সিদ্ধ হয়; কিন্তু "ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরং।" যদিও কলিতে ভক্তির অন্যান্য সাধনাঙ্গও কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে তথাপি সে সব অঙ্গ কীর্ত্তনের সহযোগেই সাধন করা কর্ত্তব্য। "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" ইত্যাদি প্রমাণে কীর্ত্তনের অতি প্রশস্ততা ধ্বনিত হইয়াছে *

৩৪। জপ।

মন্ত্রের লঘু উচ্চারণের নাম জপ। জপ ত্রিবিধ, বাচিক,

* নাম কীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "শ্রীগোবিন্দ-নামামৃত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

উপাংশু ও মানস। উচ্চ-নীচ স্বরযোগে স্পষ্ট ভাবে মন্ত্রোচ্চারণের নাম বাচিক জপ। নিজের শ্রুতি-গোচর যোগ্য ধীরে উচ্চারণ করার নাম উপাংশু। মন্ত্রার্থ-চিন্তনের সহিত দন্তে জিহ্বার আঘাত না লাগে, এরূপ ভাবে উচ্চারণের নাম মানস জপ। ইষ্টমন্ত্র করাঙ্গুলি দ্বারা এবং শ্রীহরিনামমন্ত্র মালা দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিক্রম পূর্ব্বক তর্জ্জনীর শেষ পর্ব্বে ১০ বার গণনা হইবে। মালা জপে তর্জ্জনী অঙ্গুলি বর্জ্জিত। মধ্যমার মধ্যভাগে মালা রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক একটী মালা আকর্ষণ করিতে হয়। মালা জপে সুমেরু লঙ্ঘন করিবেন না। মালা-গ্রহণের মন্ত্র —

"অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং হরিনাম জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো দাস্যং দেহি মালে তু প্রার্থয়ে॥"

মালা রাখিবার মন্ত্র —

"পতিত-পাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমম্।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥
ত্বং মালা সর্ব্ব দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাত র্নমোঽস্তু তে॥"

অনন্তর 'গুহ্যাতি-গুহ্য ইত্যাদি' মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবেন।

৩৫। বিজ্ঞপ্তি

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষ ভাবে নিবেদন করাও একটী ভক্তির অঙ্গ। ইহা, প্রধানতঃ তিন প্রকার, সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী।

৩৬। স্তবপাঠ।

শ্রীগীতা ও গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত স্তবরাজ পাঠই অধিক প্রশস্ত। স্তব কবচাদি পাঠও ভক্তির একটী সাধনাঙ্গ।

৩৭। নৈবেদ্য-স্বাদ গ্রহণ।

'অমৃতোপস্তরণ মসি' বলিয়া পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দিয়া প্রসাদ গ্রহণ বিধেয়। একবস্ত্রে, আর্দ্রহস্ত-পদে, এবং পশ্চিমাভিমুখে প্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

৩৮। পাদ্যোদক-স্বাদ গ্রহণ।

ইহার মন্ত্র যথা—

"অকাল মৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥"

এই বলিয়া ৩ বার মস্তকে জলাঞ্জলি দিবেন।

৩৯। ধূপ মাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ। ৪০। শুদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন। ৪১। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। ৪২। আরত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন। এস্থলে আদি শব্দে পূজা দর্শনও বুঝিতে হইবে।

৪৩। শ্রবণ।

কীর্ত্তনের ন্যায় ইহাও একটী মুখ্য অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ ও লীলাময় বর্ণনা শ্রবণই ইহার উদ্দেশ্য। যদিও এই সকলের কোন একটীর শ্রবণেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, তথাপি প্রথম নাম শ্রবণেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্ত শুদ্ধি হইলেই রূপ শ্রবণের যোগ্যতা ঘটে, রূপ সম্যক্ স্ফুরিত হইলেই গুণের স্ফুরণ

হয়। অনন্তর নামরূপ গুণ ও তৎ-পরিকরগণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই তবে লীলা স্ফুরণ সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এই অভি-প্রায়েই এই সাধন ক্রম লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ ক্রম, কীর্ত্তন ও স্মরণেও অনুস্মৃত হইয়া থাকে। সাধু-গণের বিরচিত প্রবন্ধাদি, সাধুগণের কীর্ত্ত্যমান নামাদি ও শ্রীভাগবত শ্রবণই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে সাধুগণের মুখে শ্রবণই সাধকের মহা ইষ্টপ্রদ। কেননা তাহাতে নিজাভীষ্ট নাম মুহুর্মুহু আবর্ত্তিত হয়। আবার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ভগবত্তা হেতু শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতম। কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রবণেরও সার্থকতা হয়, এজন্য কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য।

৪৪। তৎকৃপেক্ষণ।

অর্থাৎ কবে আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইবে, এইরূপ আশানুবন্ধে কালাতিপাত করা।

৪৫। স্মৃতি।

যে কোন প্রকারে মনের সহিত সম্বন্ধ হওয়াকে স্মৃতি কহে। এইরূপে নাম, রূপ, গুণ লীলাদি ও লীলাক্ষেত্রাদি স্মরণও একটী ভক্তির অঙ্গ।

৪৬। ধ্যান।

রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তনেব নামই ধ্যান। ধ্যান, যোগের একটী অঙ্গ হইলেও উহা আসন-প্রাণয়ামাদির ন্যায় বহিরঙ্গ ব্যাপার নহে। ধারণায় চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ হয়। এই ধারণার উচ্চ-গ্রামই ধ্যান। শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম হইতে

কেশাগ্র পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যাদি সহ চিন্তনই ধ্যান। সুতরাং ধ্যান ও স্মরণ প্রায় অভিন্ন বোধ হইলেও অল্পমাত্র ভেদ কল্পিত হইয়াছে। শ্রীভগবানে মনঃসংযোগের নামই স্মরণ এবং শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গ-লাবণ্যাদি স্মরণই ধ্যান। ধ্যান ব্যতিত ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। এই জন্যই শাস্ত্রে স্মরণ ও ধ্যানের বহুল মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত তাঁহার চরণে স্বতই অবনত হইয়া পড়ে। দাস্য লাভের জন্য ব্যগ্র হয়। মানস পূজায় ধ্যানই একমাত্র সহায়।

৪৭। দাস্য।

সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের সেবকত্ব-স্বীকারই দাস্য। দাসের কার্য্য পরিচর্য্যা। সুতরাং শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণও দাস্য। আমি "শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস" এইরূপ জ্ঞান ভক্তির একান্ত অনুকূল। সুতরাং কি সুখে কি দুঃখে সকল অবস্থাতেই কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪৮। সখ্য।

বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ। মিত্রবৃত্তিই সখ্যের প্রধান দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দকে সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে অর্থাৎ শ্রদ্ধাসহকারে অবলম্বনই সখ্যের বিশ্বাস বৃত্তি, এবং ভগবানকে প্রাকৃত বন্ধুর ন্যায় দর্শন ও তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবার জন্য যে চেষ্টা (যেমন শ্রীমন্দিরে শয়ন) তাহার নামই মিত্রবৃত্তি। এই সখ্য-সাধনে যখন বিধির অপেক্ষা না থাকে, তখন উহা রাগানুগা ভক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং এই সখ্যভাব, বিধিভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি এই উভয় প্রকারেই সাধিত হইয়া থাকে।

৪৯। আত্মনিবেদন।

শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রিয়সখা বলিয়া বোধ হইলেই তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন ঘটিয়া থাকে। যে কিছু আমার আছে, সে সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত যত্নপর না হওয়াই আত্মনিবেদনের কার্য্য। তবে যে সকল শরীরগত ও মনোগত চেষ্টা করা যায়, তৎসমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে। স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গেহ, অর্থাদি সমস্তই ভগবৎ সেবার উপকরণ—ভগবৎ সেবার উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রসাদ-স্বরূপেই স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধকের এইরূপ মনের ভাবই হইয়া থাকে। পরন্তু যথা—

"চিন্তাং কুর্য্যান্নরক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥"

যেরূপ পশু বিক্রীত হইলে উহার পালককে যেমন আর তাহার রক্ষার নিমিত্ত ভাবিতে হয় না, সেইরূপ শ্রীহরিকে আত্মনিবেদন করিয়া উহার রক্ষণের জন্য প্রযত্ন হইতে বিরত হইবে। ফলতঃ আত্মসমর্পণ করিলে "আমিত্বের" অভিমান একবারে বিনষ্ট হয়। শ্রীবলিরাজই এই আত্মদানের উদাহরণ। প্রেয়সীভাবের আত্মদান রুক্মিণীতে পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ব্রজগোপীদের যে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন তাহার তুলনা নাই। উহাই কৃষ্ণ-প্রেম-লাভের চরম পন্থা। উহা রাগানুগা ভক্তির অন্তর্গত।

৫০। নিজ প্রিয়োপহরণ।

অর্থাৎ নিজের প্রিয় দ্রব্যাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করাও একটী ভক্তি অঙ্গ। যথা—শ্রীভগবদুক্তি—

"যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে॥"

যে সকল দ্রব্য জনসমাজে অতি উৎকৃষ্ট এবং যে সকল দ্রব্য আপনার ও আমার প্রিয় হয়, তাহা আমাকে নিবেদন করিলে অনন্ত ফলপ্রদ হয়। এস্থলে আত্মপ্রিয় দ্রব্য অর্থে, শাস্ত্র-সম্মত শ্রীভগবানে নিবেদন-যোগ্য দ্রব্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, ভক্ত কদাচ ভগবানের অপ্রীতিকর অনিবেদ্য দ্রব্য ভগবানের চরণোপান্তে উপহার দিতে পারেন না।

৫১। তদর্থে অখিল চেষ্টা

অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করাও একটী ভক্তির অঙ্গ। যথা—পঞ্চরাত্রে—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

যাঁহারা ভক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক যে সকল কার্য্য করিবেন, তৎসমুদয়ই হরিসেবার অনুকূলে করিবেন। শ্রীভগবানের প্রীতি-উদ্দেশে নিখিল চেষ্টাই সাধকের প্রেমলাভেব পরম সহায়। আত্মপ্রীতির উদ্দেশে কোন কার্য্য করাই কাম। কামনাশূন্য কার্য্য করা, কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ—ইহাই কৃষ্ণপ্রেমলাভের সোপান।

৫২। শরণাপত্তি।

কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয়গ্রহণই শরণাপত্তির তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পালন ও রক্ষা কর্ত্তা, এই বিশ্বাসে একান্ত শরণাগত না হইলে প্রেমপ্রাপ্তি দূরে থাক্, ভাবও উদয় হয় না। অনন্য-গতি ভিন্ন শরণাপত্তি অসম্ভব। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই ভাগবতী আজ্ঞাই জীবের পরম মঙ্গলময়ী। শরণাপত্তি ছয় প্রকার। যথা—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥"
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ বৈষ্ণবতন্ত্র।

(১) শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প (২) উহার প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন (৩) শ্রীকৃষ্ণই আমাকে নিখিল আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, (৪) তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করা, (৫) তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা "হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যেরূপ নিয়োজিত করিতেছ, আমি সেইরূপই করিতেছি, এবং "হে দয়াময়! আপনি পরম কারুণিক, আমার ন্যায় পরম শোচ্যতম আর কেহ নাই, আমাকে রক্ষা কর",—ইত্যাদি আর্ত্তিপ্রকাশ—শরণাপত্তি এই ছয় প্রকার। ছয়টীর মধ্যে গোপ্তৃত্বে বরণই প্রধান, অপর পাঁচটী উহার পরিকর। শরণাপত্তি অহঙ্কার নিবৃত্তির প্রধান সাধন।

৫৩। তদীয়গণের সেবা

অর্থাৎ তুলসী, শাস্ত্র, মথুরা ও বৈষ্ণবাদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তু ও ব্যক্তিগণের সেবা। শ্রীতুলসী সেবা ৯ প্রকার। যথা—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥

দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, তন্মহিমা কীর্ত্তন, প্রণাম, তন্মহিমা শ্রবণ, রোপন, সেবন ও পূজন এই নয়প্রকার।

৫৪। শাস্ত্র-সেবন।

শ্রীভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনাও ভক্তির একটি প্রধান অঙ্গ। এস্থলে শাস্ত্র শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতাদি সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র গ্রন্থই বুঝিতে হইবে। এই সকল শাস্ত্রানুশীলনের ফলে হৃদয়ে পবিত্রতার সঞ্চার হয় এবং চিত্ত ক্রমশঃ বিষয় চিন্তা হইতে ভক্তির মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া একান্ত ভক্তি-প্রবণ হইয়া পড়ে। অতএব—

"বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যা স্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥" স্কান্দে

যাঁহারা নিত্য বৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, সংসারে তাঁহারাই ধন্য; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

৫৫। মথুরা সেবন।

শ্রীমথুরাধাম শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লীলা-নিকেতন—পরম যোগপীঠ। সুতরাং এই শ্রীধাম দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ বা তথায় বাস করিলে সাধকের ভক্তিবৃত্তির যে সমধিক স্ফুরণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শাস্ত্রে এই পুণ্যধাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরমানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরা স্পর্শমাত্রতঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডে।

ত্রিলোকের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় তীর্থ-সেবনেও যে পরমানন্দময়ী প্রেম-লক্ষণা সিদ্ধি দুর্লভা, মথুরা স্পর্শমাত্র তাহা লাভ হইয়া থাকে।

৫৬। বৈষ্ণব-সেবন।

শ্রীবৈষ্ণব-সেবা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে এই একটী প্রমাণ উল্লেখই যথেষ্ট। যথা—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

যত দেবদেবীর আরাধনা আছে তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তদীয় ভক্তগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।

৫৭। মহোৎসব

নিজের বৈভব অনুসারে নিজের জনগণের সহিত শ্রীভগবানের উদ্দেশে মহোৎসব করাও একটী ভক্তি-অঙ্গ। ইহাতে ভক্ত-সম্মিলনে পরস্পর ভক্তির অনুশীলন, উন্নতি ও আনন্দবর্দ্ধন হয় এবং ইহাতে বহির্ম্মুখ সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

৫৮। কার্ত্তিক ব্রত।

কার্ত্তিক মাসে নিয়ম-সেবা ইহাও ভক্তির একটী অঙ্গ। কার্ত্তিক মাসে নিয়মিত শ্রীবিগ্রহ-সেবা, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও জপাদি করিলে শ্রীভগবান্ অল্পকেও বহু করিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি সহজে লাভ হয়। এই উদ্দেশ্যেই কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

৫৯। জন্মদিন যাত্রা

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মতিথি দিনে মহোৎসব করাও ভক্তির অঙ্গ। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ ভক্তির অনুশীলন বৃদ্ধি পায় এবং শ্রীভগবানও পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ইহার পর আর যে ৫টী ভক্তি-অঙ্গ কথিত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হওয়ায় এস্থলে দ্বিরুক্ত হইয়াছে। কেন দ্বিরুক্ত হইল, তাহার কারণ এই যে—

"নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনম্।"

শাস্ত্রে যত কিছু ভক্তির সাধনাঙ্গ কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই পাঁচটীই শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত পুনরায় ইহাদের নাম করা হইল। সেই ৫টী মুখ্য ভক্তি-অঙ্গ এই—

"সাধুসঙ্গ (১) নামকীর্ত্তন (২) ভাগবৎ শ্রবণ। (৩)
মথুরাবাস (৪) শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ (৫)
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥ চৈঃ চঃ

এই পঞ্চ-সাধন অতি দুরূহ ও অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন। এই সাধন-পঞ্চকের প্রতি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা ইহাদের সহিত অল্প-মাত্র সম্বন্ধ উপজাত হইলেও চিত্তে ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। অলৌকিক পদার্থ সমূহের এমনই অচিন্ত্য শক্তি যে তাহাদের সহিত সম্বন্ধমাত্রই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভাব ও সেই ভাবের বিষয় হৃদয়ে যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই শ্রেষ্ঠতম সাধন পঞ্চকও অলৌকিক, ইহাদের অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির মহিমা শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বচন-প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ভক্তির কোন একটী মুখ্যাঙ্গ অনুষ্ঠিত হউক কিম্বা বহু অঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক, নিষ্ঠাপূর্ব্বক আচরিত হইলেই তাহা সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে বহে সদা প্রেমের তরঙ্গ ॥"



৫। **বৈরাগ্য-নির্ণয়**। ২য় সংস্করণ, শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ভজন-তাৎপর্য্য সহ পঞ্চবিধ বৈরাগ্য নির্ণয় এবং স্ত্রী-সঙ্গী মর্কট-বৈরাগীদের অপূর্ব্ব আখ্যান ও তাহার দূষণীয়তা বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত একটী বিস্তৃত পরিশিষ্ট নূতন সংযোজিত হইল। মূল্য ।০ চারি আনা। ডাঃ মাশুলাদি ৵০ এক আনা।

৬। **শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত**। যিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবেশ অবতার এবং শ্রীললিতার সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র, সেই বৈষ্ণবজগদ্‌বরেণ্য শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর অলৌকিক জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থে সুখপাঠ্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে দুই শতাধিক পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১।০ আনা। ডাক মাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

৭। **শ্রীরাধারস-সুধানিধিঃ স্তোত্র কাব্যম্**। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহানুভব কৃত মূল, শ্লোক, অন্বয়, অনুবাদ এবং ভজনতাৎপর্য্য সহ বিশদ ব্যাখা সম্বলিত। এই ভক্তজনের নিত্যাস্বাদ্য রসগ্রন্থখানি বঙ্গদেশে বঙ্গাক্ষরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ১৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

৮। **বৈষ্ণব-বিবৃতি**।—বৈষ্ণবধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার সমস্তই যে বৈদিক, তাহা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই নূতন প্রকাশিত হইল। মূল্য বাঁধাই দশ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ৵০ দুই আনা।

৯। **বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি**। মূল, শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী কৃত। প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি শ্রীল রসিকচন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ✓০ এক আনা।

১০। **শ্রীগৌর-উপদেশামৃত**। কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদবাক্য উপদেশাবলী বিস্তারিত ব্যখ্যার সহিত সঙ্কলিত। ১ম, ২য় খণ্ড একত্র বাঁধন মূল্য ১৲ টাকা।

১১। **শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী**। ৫ম, বর্ষ হইতে ৮ম, বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি সেট ১৲ টাকা স্থলে ॥৵০ আনা ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।

১২। **সিদ্ধান্ত সংগ্রহ**। কতকগুলি নিগূঢ় ভক্তি-সিদ্ধান্তের একত্র সংগ্রহ। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

১৩। **ভক্তের মহিমা**। জনৈক সিদ্ধ ভক্তের জীবন কাহিনী। মূল্য ✓০ এক আনা।

১৪। **ভক্তের সাধন**। (ভক্তিবাদ) শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কৃত 'ভক্তিসন্দর্ভের সরল বঙ্গানুবাদ। ভক্তি-বিষয়ে এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১৲ টাকা, কাগজের মলাট ৸০ আনা; ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।

১৫। **শ্রীরাস-গীতা**। শ্রীমন্মহর্ষি নারদ কথিত রাসোল্লাস তন্ত্রোক্ত। মূল্য ।০ আনা ও ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।

১৬। **শ্রীশ্রীশিক্ষামৃত**। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত 'মনঃশিক্ষা" মূল, টীকা ও বিস্তৃত অনুবাদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত "শ্রীশিক্ষাষ্টক" মূল টীকা ও বিশদ

ব্যাখ্যা সহ একত্র প্রকাশিত। এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ।৵৹ আনা।

১৭। **শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস**। প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবন লীলা সুন্দরভাবে বর্ণিত। মূল সংস্কৃত ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ৵৹ আনা।

১৮। **প্রতাপরুদ্রচরিত**। উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র যিনি শ্রীমহাপ্রভুর অসীম কৃপাপাত্র, তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্ত-জীবনের মধুময় উচ্ছ্বাস, সরল আবেগময়ী ভাষায় বর্ণিত। ইহাতে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই আছে। মূল্য ॥৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৵৹ আনা।

১৯। **বৈষ্ণব তত্ত্ব দীপিকা**। কতিপয় নিগূঢ় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মীমাংসা। দার্শনিক যুক্তির সহিত সমন্বয় করিয়া লিখিত। মূল্য ।৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৴৹।

২০। **প্রেম ও ভক্তি-সাধনা**। সাধক-জীবনের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত। গুরুর নিকট সাধন ভজন সম্বন্ধে যাহা যাহা শিখিতে বা জানিতে হয়, ইহাতে সেই সকল সাধন-প্রণালী বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধন সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য ১॥৹ টাকা স্থলে ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ৵৹ আনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী।
শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয়।
এলাটী পোঃ (জেলা হুগলী।